নভেম্বর ২০০৬ ● দশ টাকা

আনন্দমেলা

পাঁচটি জমজমাট গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পের মজাদার কমিক্‌স

বিপিনবাবুর বিপদ

(তৃতীয় কিস্তি)

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস (প্রথম কিস্তি)

কানামাছি

বিজ্ঞানে এবারের নোবেল

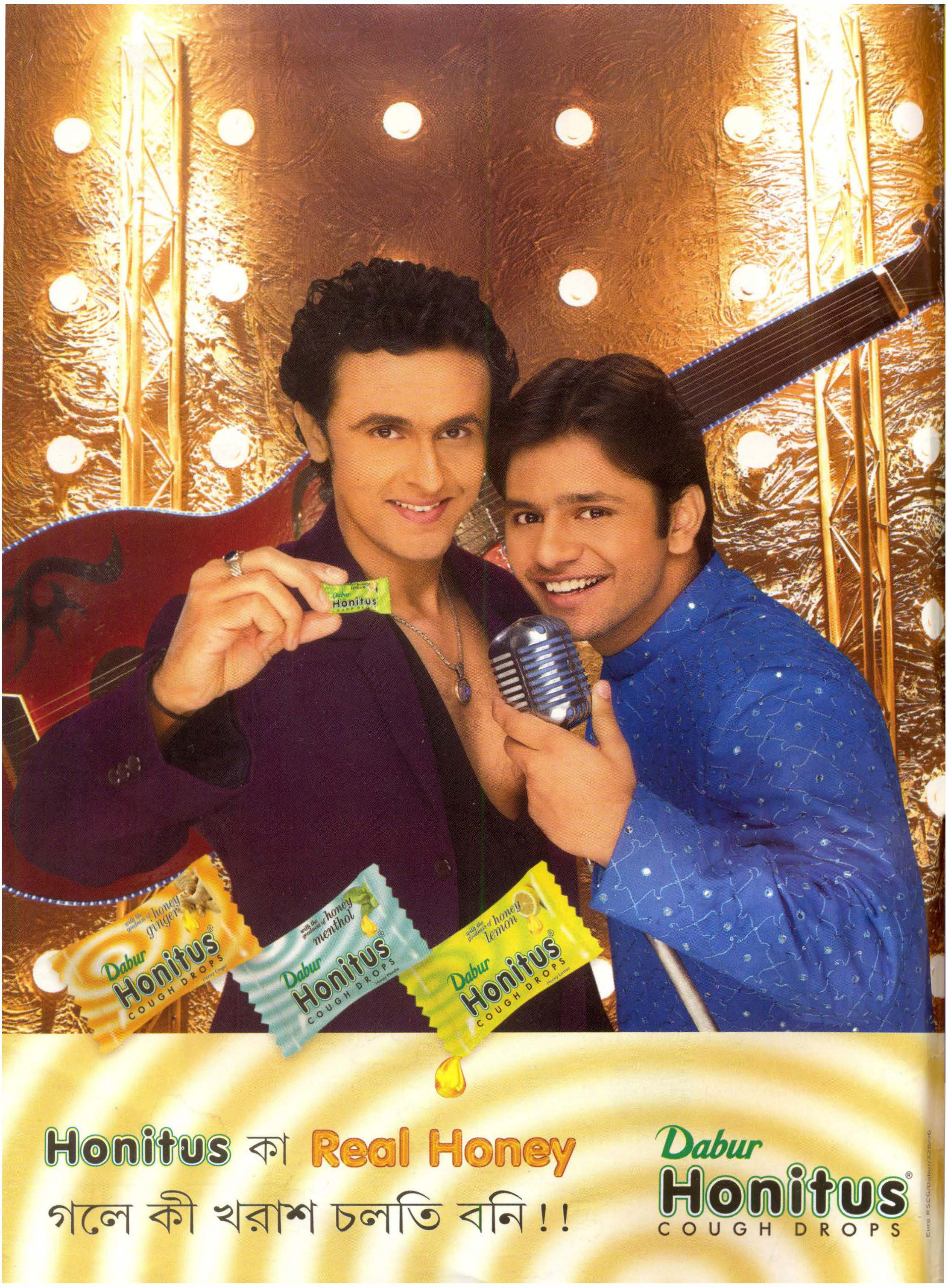
টেরাকোটার বিষ্ণুপুর

করমর্দনের কেরামতি



কমিক হিরো: ডেনিস দ্য মেনাস


দেবজ্যোতি
ধু লো খে লা
অতীতের সাগর সেঁচা মনি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষনে সাহায্য করুন



Dabur
Honitus
COUGH DROPS
with the goodness of honey ginger
with the goodness of honey menthol
with the goodness of honey lemon
Honitus का Real Honey
গলে কী খরাশ চলতি বনি !!
Dabur
Honitus®
COUGH DROPS

আনন্দমেলা

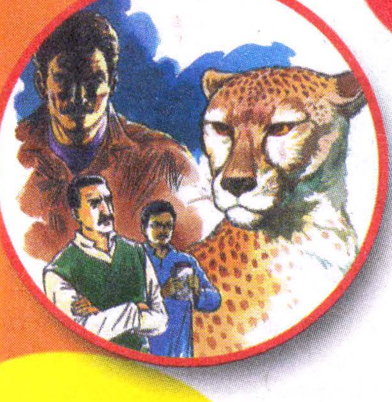
৩২ বর্ষ ৭ সংখ্যা কার্তিক ১৪১৩ নভেম্বর ২০০৬

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস

কানামাছি

তুষারকান্তি ভট্টাচার্য ২৮

তখন সার্কাসে হিংস্র জীবজন্তুদের নিয়ে খেলা দেখানোয় এখনকার মতো সরকারি নিষেধ ছিল না। পার্ক সার্কাস ময়দানে জাঁকিয়ে বসেছে 'মার্ভেলাস সার্কাস'। সিংহ, রয়াল বেঙ্গল টাইগার, চিতা, হায়েনা, হাতি, ঘোড়া, বাঁদর, ভল্লুক, কী নেই! হঠাৎ এগারো দিনের মাথায় মারা গেল দু'টো বাঘ আর দু'টো চিতা। পরের দিন আরও দু'টো চিতা। সার্কাস দলের প্রোপ্রাইটার বিউটি নায়ারের রাতের ঘুম ছুটে গেল। কে ঘটাল এমন কাণ্ড? এ কি টালা পার্কের 'দ্য গ্রেট মেট্রোপলিস সার্কাস'-এর গুপ্তঘাতকের কাজ? প্রথমাংশ এ সংখ্যায়।



শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মজাদার গল্পের জমজমাট রঙিন কমিক্স

বিপিনবাবুর বিপদ ১২ (তৃতীয় কিস্তি)

রাত ন'টা নাগাদ নবীন মুদির দোকানে এসে হাজির গোপাল আর গোবিন্দ। ওরা নবীনের গেঁজেটা কেড়ে নিল। তারপর তাকে ওরা দোকানের ভিতর ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দিল। হঠাৎ একটা বোটকা গন্ধ পেল গোবিন্দ। গোবিন্দর ঠাকুরদা এক সময় ভূত পুষতেন। এ যেন সেই গন্ধ। এত দিন পর পীতাম্বরকে লোকে ভূত ভাবতে শুরু করেছে জেনে খুশি হল সে। এর পর কী ঘটল?

ছবি: স্বপন দেবনাথ



অন্যান্য পাতায়

ডাকবাক্স ৪
পাঠকের পাতা ৭
কুইজ ৩৮
ক্যাম্পাস ৪২
কমিক হিরো ৪৩
বেড়ানো ৫৪
অমিল খোঁজো তফাত বোঝো ৫৮
হাসছি দ্যাখো ৫৮
অর্থ শেখো, শব্দসন্ধান ৫৯
পুরস্কার ৬১

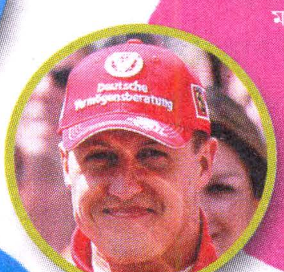
প্রচ্ছদ: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

সম্পাদক: **পৌলোমী সেনগুপ্ত সরকার**

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।

খেলাধুলো

মাইকেল শুমাখার ৬২ শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ৬৩ চন্দন রুদ্র
মুনাফ কি পারবেন... ৬৪ অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়
বিন্দ্রার অভিনবত্ব ৬৫ সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়
ফ্রিস্টাইল ৬৬ চন্দন রুদ্র



গল্প

আত্মত্যাগী দেবশর্মা ৮ রঞ্জিতা ঘোষ
মালঞ্চ নাইট স্কুল ৩৯ রোহণ কুদ্দুস
হিদাসপাসের যুদ্ধ ৪৪ দেবাশিস মজুমদার
গৌরী সেনের চশমা ৪৮ জয়দীপ চক্রবর্তী
গল্পের শেষটা নতুন ৫৫ গৌর বৈরাগী







কবিতা ছাপা হোক

'পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা' পড়ে ভাল লাগল। সারা বছর আমি পূজাবার্ষিকীর জন্য অপেক্ষা করে থাকি। অক্টোবর সংখ্যা আনন্দমেলায় দশটি গল্প পড়েও আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু এই পত্রিকায় কবিতা ছাপা হচ্ছে না কেন? আমার অনুরোধ, আমাদের পাঠানো ছোট কবিতা আনন্দমেলায় ছাপা হোক।

দীপাঞ্জন আদক
নবম শ্রেণি, বাজকুল জনকল্যাণ শিক্ষানিকেতন
পূর্ব মেদিনীপুর

সম্পাদকীয় উত্তর: 'আনন্দমেলা'র সাধারণ সংখ্যায় কবিতা ছাপা হয় না। 'পাঠকের পাতা' বিভাগে অনেক সময় তোমাদের লেখা ছড়া ছাপা হয়।



চাই বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

'আনন্দমেলা' পড়তে খুবই ভাল লাগে। এই পত্রিকায় বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ছাপা হলে আরও ভাল লাগবে। দয়া করে আদ্যিকালের ভূতের গল্প ছাপবেন না।

পৃথ্বীশ ঘোষ
দশম শ্রেণি, জিরাট কলোনি হাই স্কুল
(ই-মেল-এর মাধ্যমে)

মহাকাশ নিয়ে লেখা

'আনন্দমেলা' পড়তে দারুণ লাগে। পোকেমন ও বেব্লেড নিয়ে আরও লেখা ছাপা হলে ভাল হয়। রূপকথার গল্প এই পত্রিকায় ছাপা হলে ভাল লাগবে। মহাকাশ নিয়েও লেখা চাই আমার প্রিয় আনন্দমেলার পাতায়।

অর্চিতা দে
উত্তরপাড়া মডেল হাই স্কুল
(ই-মেল-এর মাধ্যমে)

জমাটি সেপ্টেম্বর সংখ্যা

সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'আনন্দমেলা' পড়ে দারুণ লাগল। 'কৃষ্ণলামার গুম্ফা', 'পাখিবন্ধু', 'ভ্যাকুয়াম ক্লাবের দুর্গ-প্যান্ডেল' এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'বিপিনবাবুর বিপদ' কমিকের আকারে পেয়ে খুব ভাল লাগল। এই সংখ্যার প্রচ্ছদটিও অসাধারণ। প্রতি মাসেই এ ধরনের আনন্দমেলা চাই!

কাব্যায়ন রায়
অষ্টম শ্রেণি, সোদপুর হাই স্কুল

পূজাবার্ষিকী দারুণ

এবারের 'পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা' পড়ে দারুণ লাগল। বিশেষ করে 'ঝাও ঝিয়েন হত্যারহস্য' এবং 'এবার কাকাবাবুর প্রতিশোধ'। এ ছাড়াও 'মানুষ পাচার', 'অদৃশ্য নজরদার', 'ডলফিনের গান', 'জগু ও পুজোর অ্যাডভেঞ্চার'ও ভাল লাগল। 'ফেলুদা কমিক্স'-এ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের আঁকা ফেলুদাকে দেখে মনে হয়েছে যে, যেন পরদায় ফেলুদাকে দেখছি।

শ্রীজয়ী ঘোষ
ষষ্ঠ শ্রেণি, শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, হুগলি

অপেক্ষা আগামী বছরের জন্য

'পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা' পড়ে ভাল লাগল। গোয়েন্দা উপন্যাসগুলো আমাদের পুজোর আনন্দও যেন অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এ ছাড়া অন্যান্য লেখা পড়েও ভাল লেগেছে। এখন থেকেই আগামী বছরের পূজাবার্ষিকীর জন্য অপেক্ষা করে থাকব।

দেবব্রত পাল
আমডাঙা, উত্তর চব্বিশ পরগনা

ভাল লেগেছে পূজাবার্ষিকী

পূজাবার্ষিকীতে শিবরাম কমিক্স আর কাকাবাবু উপন্যাস খুব ভাল লেগেছে। সন্তু ও কাকাবাবুকে নিয়ে কমিক্স ছাপা হচ্ছে না কেন? 'রসায়নের রেসিপি' থেকে হাতে কলমে পরীক্ষা করে মজা লেগেছে! বেস্‌বল নিয়ে লেখা চাই।

শৌনক বন্দ্যোপাধ্যায়
দশম শ্রেণি, বরাহ নগর বিদ্যামন্দির, কলকাতা

নাঙ্গা পাহাড়ের মমি: লেখিকার বক্তব্য

সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'ডাকবাক্স' বিভাগে কিশলয় মুখোপাধ্যায়ের চিঠির প্রসঙ্গে জানাই যে, আমার লেখা 'নাঙ্গা পাহাড়ের মমি' গল্পটিতে টিনটিনের গল্পের ছায়া আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ, টিনটিনের 'দ্য মিস্ট্রি অফ সেভেন ক্রিস্টাল্‌স' গল্পটি আমি পড়িনি। আমার গল্পটি একটি সত্য ঘটনার ভিত্তিতে লেখা। কয়েকটি জায়গায় অবশ্য কল্পনার সাহায্য নিয়েছি। অনেকেই গল্পটি বুঝতে পারেনি। কারণ, মমি কাউকে খুন করেনি (ডাক্তার হিতেন ব্যানার্জি ছাড়া), বাকি পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে মমির অভিশাপে। আমি কিশলয় মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করব, সে যেন সত্যজিৎ রায়ের লেখা 'তুতানখামেনের সমাধি' গল্পটি পড়ে দ্যাখে। এই গল্পে লেখা আছে যে, যাঁরা তুতেনখামেনের সমাধিতে ঢুকেছিলেন, তাঁদের আটজন বিভিন্ন অসুখে মারা যান অথবা আত্মহত্যা করেন। মমির অভিশাপ নিয়ে অনেক গল্পই প্রচলিত আছে, যার মধ্যে কয়েকটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা।

সুখলতা মজুমদার
কলকাতা-৭০০ ০৩১

পত্রিকা ভাল লাগলে জানাও, খারাপ লাগলেও। ডাকে তো বটেই, এখন চিঠি পাঠাতে পার 'ই-মেল'-এও।
ঠিকানা:
anandamela@ abpmail.com
লেখকের স্কুলের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।



Dabur RED Toothpaste & anandamela আনন্দমেলা present
Dental Care Camp
লবঙ্গ, পুদিনা, তোমর
এবার দাঁতের প্রবলেম
চল হট!
নতুন প্যাক
डाबर
लाल दन्त मंजन
स्वस्थ मसूड़े
मज़बूत दाँत
Dabur RED Toothpaste
With the goodness of Laung, Pudina and Tomar
Dabur RED Toothpaste
Strong teeth. Keeps dental problems away.
তোমার দাঁতের পরীক্ষা
করতে ডাক্তারকাকু
আসছেন তোমার স্কুলে।
জেনে নাও কী করে দাঁত
রাখবে সজীব-সতেজ।
Radio Partner
RED FM 93.5
Bajaate Raho!
লবঙ্গ দাঁতের
ব্যথার সঙ্গে লড়ে।
তোমর জীবাণু
ধ্বংস করে।
পুদিনা নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ
রোধ করে।

প্রিয়জনকে

আনন্দ উপহার

গিফ্‌ট কুপন

১২৫ টাকা, ২৫০ টাকা, ৫০০ টাকা, ও ১,০০০ টাকা মূল্যের এই কুপনের বিনিময়ে পাবেন পছন্দের বই। কুপন কেনার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে বই সংগ্রহ করতে হবে। গিফ্‌ট কুপন পাওয়া যাবে ৬৭ এ, মহাত্মা গাঁধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯০/২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০২৯-এ অবস্থিত আমাদের বিপণন কেন্দ্র থেকে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদা সমগ্র ১ । ১২৫.০০

ঘনাদা সমগ্র ২ । ২০০.০০

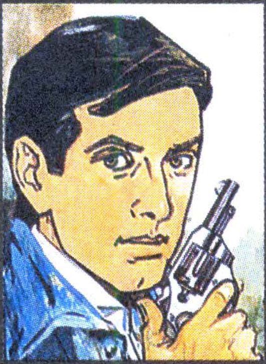
ঘনাদা সমগ্র ৩ । ১২৫.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

টেনিদা সমগ্র ১২৫.০০









সত্যজিৎ রায়

ফেলুদা সমগ্র (দু'খণ্ড একত্রে) ৭৫০.০০

বুদ্ধদেব গুহ

ঋজুদা সমগ্র ১ । ১২৫.০০

ঋজুদা সমগ্র ২ । ১২৫.০০

ঋজুদা সমগ্র ৩ । ১৫০.০০

ঋজুদা সমগ্র ৪ । ১২৫.০০

ঋজুদা সমগ্র ১ । ১০০.০০



দক্ষিণ কলকাতায় আনন্দ-র বই
১৯০/২ রাসবিহারী এভিনিউ,
কলকাতা ৭০০ ০২৯, ফোন: ২৪৬৪-৬২১২
এখানে পাবেন আনন্দ-প্রকাশিত সমস্ত বই।
নিজের হাতে দেখে পছন্দ করে
বই কেনার সুযোগ।
রবিবারেও খোলা থাকছে।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন: ২২৪১ ৪৩৫২, ২২৪১ ৩৪১৭, ই-মেল: ananda@cal3.vsnl.net.in ওয়েবসাইট : www.anandapub.com

আনন্দ

'আমার মনের মতো চ্যানেল'

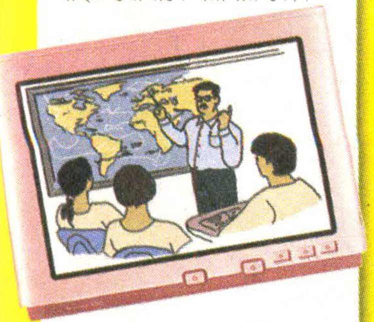
প্রতিযোগিতার ফলাফল।



পা ঠ কে র পা তা

১

টিভির সামনে গেলেই বাড়ির বড়রা প্রত্যেকেই আমাকে ভীষণ বকেন, আর পড়ার কথা বলেন এবং টিভি দেখতে দেন না। তাই আমি যদি সুযোগ পাই তা হলে এমন একটি চ্যানেল তৈরি করব, যার নাম হবে 'স্বপ্নের দুনিয়া'। এতে কিছু প্রোগ্রাম লাইভ হবে। লাইভ প্রোগ্রামে সরাসরি ফোন



করে যে-কোনও ছাত্রছাত্রী তার পাঠ্যবইয়ের কোনও অংশ বুঝে নিতে পারবে। তা হলে টিভির সামনে বসলে আমার মতো অনেককেই আর বকুনি খেতে হবে না। এ ছাড়াও চ্যানেলটিতে প্রতিটি বিষয় বোঝানোর পরে পরীক্ষায় ভাল ফল করার জন্য অথবা ছাত্রছাত্রীদের ভালর জন্য একটি করে 'টিপ্‌স' দেবে এবং তা হলেই কেউ টিভি দেখার জন্য আপত্তি করবেন না। শুধু পড়ার বিষয়ই নয়, এই চ্যানেলে দেখানো হবে নাচ, গান, নাটক ছাড়াও খেলাধুলো ও বিনোদন। তবে এসবের মধ্যে নিশ্চয়ই থাকবে এক ঘণ্টার একটি কার্টুন প্রোগ্রামও। বাড়ির বড়রা যখন দেখবেন ছোটদের পড়ার কোনও ক্ষতি হচ্ছে না এবং চ্যানেলটির টিপ্‌স শুনে ছোটরা পড়াশোনায় মন দিয়েছে, তখন টিভি দেখতেও তাঁরা কেউ আপত্তি করবেন না।

দেবপ্রীতি জানা
অষ্টম শ্রেণি
রাজকুমারী সান্ত্বনাময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

২

'ওয়ার্ল্ড টেলিভিশন ডে'-তে যদি আমার মনের মতো চ্যানেল করতে দেওয়া হয়, তবে আমি সব ছোটদের মনের মতো চ্যানেল 'কিড্‌স এন্টারটেনমেন্ট টেলিভিশন' তৈরি করব। চ্যানেলটিকে আমি চব্বিশ ঘণ্টার করতে চাই না। কারণ, সকালে ও দুপুরে ছোটরা স্কুলে থাকে। তাই চ্যানেলটা হবে সকাল ছ'টা থেকে আটটা ও দুপুর তিনটে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। সকালে আমি রাখতে চাই আমাদের সকলের প্রিয় ফেলুদা ও টিনটিনের কার্টুন এক ঘণ্টা করে। দুপুরে হাতের কাজ শেখানোর একটা অনুষ্ঠান, যাতে আমরা শিখতে পারি ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়েও কত অসাধারণ জিনিস বানানো যায়। বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত আমি রাখব কুইজ় কম্পিটিশন, টম অ্যান্ড জেরি কার্টুন, অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড এবং গান-নাচের প্রোগ্রাম। এ ছাড়া দিনে চারবার থাকবে ছোটদের উপযোগী নিউজ। তবে আমার চ্যানেলের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হবে নামী মানুষদের



সাক্ষাৎকার, যা থেকে আমরা জীবনে কিছু করে দেখাবার রসদ খুঁজে পাব।

কৌশিতকী কর্মকার
ষষ্ঠ শ্রেণি
দিল্লি পাবলিক স্কুল
ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ

৩

আমার মনের মতো চ্যানেলে অবশ্যই ছুটির দিনগুলোতে দুপুরে এবং অন্য দিনগুলোতে রাত্রি ১০টা থেকে ১১টার সময় বৈচিত্রপূর্ণ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করব। ছুটির দিনগুলোতে দুপুরের দিকে চ্যানেলটিতে দেখানো যেতে পারে মহাপুরুষদের শৈশবের কাহিনি নিয়ে অথবা কোনও খেলোয়াড়ের



সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে ওঠার কাহিনি নিয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচিত্র। অবশ্যই এর মধ্যে থাকবে জীবজগতের বিবর্তন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে ছবি। সহমর্মিতা, দেশপ্রেম মানুষের এই মৌলিকগুণগুলো বিকশিত হয়ে ওঠে এমন সব কাহিনি থাকবে এই সব ছবিতে। সপ্তাহে একটা দিন সাধারণ জ্ঞান ও সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে কুইজ় কনটেস্টেরও ব্যবস্থা থাকতে পারে। আমার কল্পনার প্রিয় চ্যানেলটিতে কখনওই মারামারি, খুন, রাহাজানি বা হিংসাশ্রয়ী কাহিনিচিত্র থাকবে না।

মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায়
সপ্তম শ্রেণি
ক্ষীরপাই ডঃ এস কে বর্মন মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল
পশ্চিম মেদিনীপুর

এবারের প্রতিযোগিতা

যে-কোনও কমিক চরিত্রই তোমাদের খুব প্রিয়। ধরো, শীতের সকালে কোথাও তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল টিনটিনের। কেমন হবে সেই 'টিনটিনের সঙ্গে কাল্পনিক সাক্ষাৎকার'? ১০ টি বাক্যে লিখে পাঠাও আমাদের। ক্লাস ফোর থেকে এইটে যারা পড়ো তারাই শুধু লেখাটি লিখে পাঠাবে ২০ নভেম্বর তারিখের মধ্যে। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে লেখাটি প্রত্যয়িত করিয়ে দিও। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা ডিসেম্বর সংখ্যায় ছাপব। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম আর ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে।

ঠিকানা:
পাঠকের পাতা
আনন্দমেলা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০১

আত্মত্যাগী দেবশর্মা

রঞ্জিতা ঘোষ



শ্রীনগরী আজ নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ। বাইরের হিমেল হাওয়াও ভয় পাচ্ছে কথা বলতে। প্রাসাদের কুঠরিতে গভীর চিন্তায় মগ্ন একজন। তিনি মন্ত্রী দেবশর্মা। নিদ্রিত নগরীর চিরজাগ্রত মন্ত্রী। এত গভীর রাত্রেও স্বল্প দীপালোকে একাকী পদচারণা করছেন। দেওয়ালে তাঁর ঘন-গম্ভীর ছায়া পড়ে আছে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতো। শুধু আজ নয়, তিনি জেগে আছেন পরপর কয়েক রাত্রি। কপালে চিন্তার গভীর রেখা। সৌম্য মুখখানি যেন অথই সাগরের জলে ডুবে থাকা জলজ গুল্মের মতো ধীরে স্পন্দিত হয় মাঝে-মাঝে। বাইরে নিশাচর পাখি ডাকে। প্রহরীর পদশব্দে পাশমোড়া খায় রাতের প্রাসাদ।

কাশ্মীররাজ জয়াপীড় বন্দি। অসহ্য এই সত্য। দৃপ্ত সিংহকে বন্দি করে ক্ষুদ্র মূষিক? কেউ শুনেছে কখনও? দিগ্বিজয়ী জয়াপীড়, পরাক্রান্ত জয়াপীড়। তিনি বন্দি? বন্দি নেপালরাজ অরমুড়ির কাছে? ক্ষুদ্র অরমুড়ি, ধূর্ত অরমুড়ি! কী করে এমন অসম্ভব সম্ভব হল? ভেবে পান না মন্ত্রী দেবশর্মা। কাশ্মীররাজ বন্দি! বন্দি এক দুর্গম দুর্গে। সেখান থেকে অরমুড়ির চোখ বাঁচিয়ে তাঁকে উদ্ধার করা? অসম্ভব! অসম্ভব! অস্থির পায়ে পদচারণা করেন দেবশর্মা। অসম্ভব, শেষে অপদার্থ অর্কমণ্যের বরণীয় এই শব্দটির কাছে পরাভব স্বীকার করতে হবে মিত্রশর্মার পুত্র দেবশর্মাকে? কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের প্রধানমন্ত্রীকে? দেবশর্মা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন মুহূর্তের জন্য। তারপর আবার তলিয়ে যান চিন্তার অতলে। জ্ঞান হারালে চলবে না তাঁর। মহারাজ জয়াপীড়ের মন্ত্রী তাঁর রাজাকে উদ্ধার করবেনই। বের করে নিয়ে আসতে হবে তাঁকে অরমুড়ির হাত থেকে, খরস্রোতা কালগণ্ডিকার তীরের ওই দুর্গ থেকে। কিন্তু কীভাবে? আরও একটি রাত কেড়ে নেয় দেবশর্মার যাবতীয় ঘুম।

ঘুম নেই জয়াপীড়ের চোখেও। অন্ধকার কক্ষ, না আসে সূর্যের আলো, না পড়ে চাঁদের কিরণ। শুধু নীচে নদীর তীব্র



ফেনপুঞ্জ খলখল অট্টহাস্যে ভেসে চলেছে অনুক্ষণ। উপহাস, নদীও উপহাস করছে জয়াপীড়কে। বিদ্রুপ! ও কী তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ এই নেপালরাজ ক্ষুদ্র অরমুড়ির! তাঁর পরিহাসে উজ্জ্বল মুখ কিছুতেই মুহূর্তের জন্যও মুক্তি দেয় না জয়াপীড়কে। নির্বোধ তুমি, নির্বোধ কাশ্মীররাজ জয়াপীড়, নদীও যেন বলছে আজ। প্রাপ্য, প্রাপ্য, প্রাপ্যই তো এই লাঞ্ছনা। আত্মধিক্কারের সীমা নেই আজ তাঁর। নিজে বন্দি, ভূলুণ্ঠিত কাশ্মীরের গৌরব। ছিঃ ছিঃ, প্রতিকার নেই এ অসম্মানের! উপায় নেই এই দুর্গের প্রাকারের বাইরে পা রাখার! কল্পনারও অতীত তা আজ। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে দিগ্বিজয়ী জয়াপীড়ের সম্পর্ক বলতে অন্ধকার কক্ষের ওই গবাক্ষ। যদিও কোনও গরাদ নেই তাতে, কিন্তু ঝাঁপ দিয়ে পড়লে চুরমার হয়ে যেতে হবে পাথরের আঘাতে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে নদীর উত্তাল ঢেউয়ের বেগে। বহু নীচে ওই কালগণ্ডিকার সফেন তরঙ্গমালা যেন আঁকা ছবির মতো স্থির মনে হয় দৃষ্টিভ্রমে, অথচ প্রবাহের বিরাম নেই। নদী, হে নদী! সর্বনাশী নদী! এমনই এক নদীর খেয়ালে আজ জয়াপীড় বন্দি।

হিমালয়ের কোলে শান্ত নেপালের উপত্যকায় দু' কূল ছাপানো জলরাশির মতো যখন আছড়ে পড়ল কাশ্মীরের দুর্দম সৈন্যবাহিনী, তখন ভীরু খরগোশের মতো গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন অরমুড়ি। তিনি কিছুতেই ধরা দিলেন না। হিংস্র বাজের মতো জয়াপীড় পিছু ধাওয়া করলেন তাঁর। কিন্তু আশ্চর্য, মরীচিকার মতো অরমুড়ি কেবলই সরে যেতে লাগলেন দূর থেকে দূরে, আরও দূরে। না, উত্তরে নয় দক্ষিণে। পূর্বসাগরের দিকে। জয়াপীড়ের জেদ বড় ভয়ংকর। তিনি অরমুড়িকে ধরবেনই।

কাশ্মীররাজের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছেন কত বড়-বড় রাজা। অথচ কী অহঙ্কার এই অরমুড়ির! পালাচ্ছেন, কিন্তু ধরা দিচ্ছেন না! কী চান উনি? উনি কি জানেন না যে, সমুদ্রের শেষ সীমা পর্যন্ত ওঁকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে নদীর স্রোতের মতো উন্মত্ত কাশ্মীরবাহিনী! শেষটায় একটু আমোদ বোধ করলেন জয়াপীড়। সমুদ্রের একেবারে কাছাকাছি তাঁরা। ওই নদীর ওপারেই তাঁবু ফেলেছে নেপালের সৈন্যদল। আজই অরমুড়ির শেষ দিন। ভাবছিলেন কাশ্মীররাজ। কতক্ষণ, আর কতক্ষণ! আশ্চর্য, অরমুড়ির শিবিরে কিন্তু কোথাও নেই ভয়ের লেশ। কী আনন্দে তারা আজ বাদ্য বাজাচ্ছে! আনন্দ-কোলাহলে, গানে আর উৎসবে যেন মাতোয়ারা তারা। আশ্চর্য! ক্রমেই অবাক হচ্ছেন জয়াপীড়। রাগী সিংহ যেমন করে কেশর নাড়ে, ক্রমশই তিনি ক্রোধে তেমনই ফুলে-ফুলে উঠছেন। পায়চারি করছেন, দেখছেন নেপাল শিবিরের রংবেরঙের পতাকা, আর ইচ্ছে করছে এক থাবার আঘাতে ওই তুমুল খুশি থামিয়ে দিতে। কানে যেন অসহ্য ওই হর্ষধ্বনি। হঠাৎই সিদ্ধান্ত নিলেন জয়াপীড়, "আক্রমণ করো নেপাল শিবির।" সৈন্যরাও প্রস্তুত ছিল। ঝাঁপিয়ে পড়ল নির্দেশ পাওয়া মাত্র।

মোহনার কাছাকাছি বলে খুবই চওড়া নদীর খাত। কিন্তু ওইটুকুই। মাত্র হাঁটুজল তাতে। অনায়াসে এগিয়ে চলল লোকলশকর, রসদপত্র, হাতি, ঘোড়া সব। নেপাল শিবিরের আনন্দ কোলাহল যেন দ্বিগুণ হল। ওরা কী জয়াপীড়কে স্বাগত জানাচ্ছে? হতেও পারে। এখন আর কী-ই বা করার আছে, সানন্দে বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া? দিগ্বিজয়ী জয়াপীড়ের কাছে আত্মসমর্পণ তো স্বাভাবিক ঘটনা। উলটো কিছু ঘটানোর মতো উদ্ভট কল্পনা এত দিন ধরে মনে-

মনে পোষণ করলেন কী করে অরমুড়ি? বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া জয়াপীড়কে হারিয়ে জয়লাভ করার স্বপ্ন কেউ দ্যাখে না। এখন তো জয়াপীড়ের করুণার পাত্র তিনি। কিন্তু এত হয়রানি করার পরও তাঁকে একেবারে ক্ষমা করে দেওয়া কি উচিত হবে? অবশ্য দুর্বলের অপরাধ লঘু করে দেখার চেষ্টাই ভাল। হাতির পিঠে বসে মাঝনদীতে এগোতে-এগোতে ভাবছেন জয়াপীড়। হঠাৎ ও কী! জলকল্লোলের শব্দ যেন! চকিতে মোহনার দিকে চোখ গেল তাঁর। সেদিক থেকে ছুটে আসছে উদ্বেল জলরাশি। যেন হা-হা করে গিলতে আসছে রাক্ষসী সর্বনাশী। সৈন্যদের ভীত আর্তনাদ, "জোয়ার-জোয়ার-জোয়ার আসছে!"

নেপাল শিবিরে রণবাদ্য তুঙ্গে। আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। সমুদ্রের কাছের অঞ্চলে এভাবে হঠাৎ জোয়ারে ভেসে যায় প্রায় শুষ্ক নদীখাত। জানা ছিল না জয়াপীড়ের। কিছু বুঝবার আগেই সব শেষ। ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল, রসদপত্র, হাতি-ঘোড়া। মুহূর্তের মধ্যে নিঃস্ব কাশ্মীররাজ। ভেসে গেল শিরস্ত্রাণ, তরবারি, রাজবেশ। যখন চতুর অরমুড়ির দক্ষ সৈন্যরা তাদের নৌকোয় টেনে তুলে বন্দি করে তাঁকে নিয়ে গেল তাদের রাজার কাছে, তখন তাঁর পরনে নেই এক খণ্ড বস্ত্রও। কালগণ্ডিকার ঢেউ দিবারাত্র মনে পড়িয়ে দেয় সেই ভয়ংকর স্মৃতি। চোখ বুজলেন জয়াপীড়। তাঁর সব অহঙ্কার আজ চূর্ণ। বন্দি রাজার চোখে টলটল করে দু' ফোঁটা জল, যদিও তিনি বীর, যদিও তিনি জয়াপীড়।

॥ ২ ॥

রাজা অরমুড়ি অপেক্ষায় ছিলেন এমনই দিনের। আজ এই ক্ষুদ্র রাজ্যে আসতে হচ্ছে কাশ্মীরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মন্ত্রী দেবশর্মাকে। আসতে হচ্ছে তাঁর দাম্ভিক রাজাকে উদ্ধারের আশায়। উপযুক্ত মুক্তিপণ না পেলে বন্দিপ্রত্যর্পণ নয়, ভেবেই রেখেছেন অরমুড়ি। দেবশর্মা অবশ্য দূতের মুখে বলেই পাঠিয়েছেন, রাজাকে মুক্তি দিলে কাশ্মীর রাজ্যটাই তুলে দেবেন অরমুড়ির হাতে। সঙ্গে দিগ্বিজয়ের সময় পাওয়া যাবতীয় ধনসম্পদ। বোঝেন, অরমুড়ি বোঝেন, কাশ্মীরকেশরী জয়াপীড়ের শুধুমাত্র প্রাণটার মূল্যের কাছে এ মুক্তিপণ কিছু না, কিছু মাত্র না। এরকম বীর, জীবিত থাকবার সুযোগটুকু পেলেই শুধু কাশ্মীরমণ্ডল কেন, গোটা ভারতভূমণ্ডল বারংবার জয় করে নেওয়ার শক্তি ধরেন। তবু মনে-মনে উৎফুল্ল নেপালরাজ। আজ তাঁর জয়ের উল্লাস তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগের দিন।

এলেন মাননীয় দেবশর্মা। কী অপূর্ব দেহকান্তি! অবাক হয়ে অপলক চেয়ে রইল গোটা নেপাল রাজসভা। দীর্ঘকায়, কপাটবক্ষ, গৌরবর্ণ কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ। প্রশস্ত ললাট। বুদ্ধিদীপ্ত দু' চোখে গভীর প্রশান্তি। যুবাপুরুষ, অথচ উপস্থিতিতে উগ্রতা নেই এতটুকু। যেন ঢেউহীন স্বচ্ছ জল। দেখলে মাথা নত হয়। মুগ্ধ রাজা অরমুড়ি। মনে-মনে ভাবলেন, সার্থক ওঁর নাম।

প্রথাগত সৌজন্য বিনিময়ের পর উভয়ে প্রবেশ করলেন পৃথক মন্ত্রণাকক্ষে। আলোচনায় বসে মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে দেবশর্মা বললেন, "মহামান্য নেপালরাজ! আপনার কাছে শপথ করেছি বটে যে, দিগ্বিজয়ে পাওয়া সমস্ত ধনসম্পদ আপনার হাতে অর্পণ করব, কিন্তু..." চিন্তিত দেখাল তাঁকে।

অরমুড়ি উৎসুক হলেন, "কিন্তু?"

"তার হদিশ আমার এখনও অজানা।"

বিস্মিত অরমুড়ি বললেন, "তা হলে?"

"উপায় একটা আছে।" বিচক্ষণতার আভাস দেবশর্মার গলায়, "আমি সঙ্গে এনেছি রাজার বিশ্বস্ত অনুচরদের। তারা মিশে আছে রাজার সৈন্যদলে। অত জনকে একসঙ্গে নিয়ে এই মুহূর্তে আপনার প্রাসাদে প্রবেশ শোভনও নয়, নিরাপদও নয়। তাই তারা আছে কালগণ্ডিকার ওপারে আমার শিবিরে।"

"কিন্তু কী করে বুঝবেন কে ছিল প্রধান সম্পদরক্ষক? সে কি আত্মপরিচয় দেবে? ওই বিপুল সম্পদরাশি আত্মসাৎ করবার লোভ সামলাতে পারবে? সত্যি কথা বলবে?"

"একে-একে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। যতক্ষণ না ঠিক লোককে পাই, ততক্ষণ কাউকে এই প্রাসাদ থেকে শিবিরে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না, কারাগারে বন্দি করে রাখা হবে।"

"কিন্তু তাতেও যদি কেউই স্বীকার না করে?" একই সঙ্গে চিন্তা ও হতাশা প্রতিধ্বনিত হল অরমুড়ির কথায়।



"হুম।" বাস্তবিকই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাল দেবশর্মাকে, "সে আশঙ্কা ষোলো আনাই থেকে যায়।"

"তা ছাড়াও প্রধান সম্পদরক্ষকের নাম রাজা সকলের কাছেই গোপন রাখবেন। হঠাৎ করেই রাজা বন্দি হলেন। তারপরই যে মুক্তিপণের খোঁজ পড়বে, যুদ্ধে জেতা টাকাকড়ির খোঁজ পড়বে, এ তো সকলেরই জানা। কাজেই সে যদি সঙ্গে-সঙ্গেই গা-ঢাকা দিয়ে থাকে, দূর দেশে পালিয়ে গিয়ে থাকে, কীভাবে খোঁজ পাবেন তার? অসম্ভব!"

"রাজা যখন দিগ্বিজয়ে যান, আমি তো তখন কাশ্মীরে তাঁর রাজ্যপাট সামলাতে ব্যস্ত। এখন আমি যাদের তাঁর বিশ্বস্ত মনে করছি, তাদের সঙ্গে করে এনেছি। কিন্তু তাদের চেয়েও বিশ্বস্ত অন্য কাউকে যদি তিনি সেই দায়িত্ব দিয়ে থাকেন, আর সে যদি নিজে থেকে না জানায়! নাঃ, কোনও উপায় দেখছি না।"

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। প্রত্যেকেই মনে-মনে দ্রুত চিন্তা করছেন। কপালে ভুরুর ভাঁজে অস্থিরতা। মুখোমুখি দেবশর্মা আর অরমুড়ি। নৈঃশব্দ্য ভাঙলেন দেবশর্মা। একটু কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, "বাকি রইল একটি মাত্র পথ।" আগ্রহী নেপালরাজ। তাঁর সুগোল মুখমণ্ডল যেন গোটা একটা প্রশ্নচিহ্ন হয়ে ফুটে রয়েছে।

"যদি একটিবার আমায় দুর্গে বন্দি মহারাজ জয়াপীড়ের সঙ্গে দেখা করতে দেন! তাঁর কাছেই জেনে নেব গোপন সেই নাম।"

"তা কী করে হয়?" সতর্ক অরমুড়ি। বিপুল অস্বস্তি তাঁর অপ্রস্তুত ভঙ্গিমায়।

"কেন হয় না মহারাজ?" বেপরোয়া, মরিয়া দেবশর্মা। কিছুটা মিনতিও কি মিশে গেল তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বরে? "আমি একাই যাব এবং নিরস্ত্র।"

রাজি হলেন অরমুড়ি। যাবেন তো এই দিব্যকান্তি দেবশর্মা। একা এবং নিরস্ত্র। ভয় কী? কত দিন, কত দিন পর জয়াপীড়। কত দিন পর দেবশর্মা। দু'টি আবেগের মুখোমুখি। কথা নেই কারও মুখে। চোখে বাষ্প। দেবশর্মা স্তম্ভিত, নির্বাক, নিস্পন্দ। তাঁর রাজা? কাশ্মীরকুলতিলক? চেনা যায় না। মনে পড়ল শ্রীনগরীর পথে এক খণ্ড তুলোট মেঘের মতো একটি চঞ্চল কম্বোজদেশীয় সাদা ঘোড়া, তার পিঠে বরফচূড়ার মতো উন্নত কান্তিমান জয়াপীড়ের ব্যস্ত অশ্বচালনা। তীক্ষ্ণনাসা, তীক্ষ্ণ চিবুক, উন্মুক্ত তরবারি হাতে। রাজসভায় হাস্যোজ্জ্বল মুখ, অল্প-অল্প মাথা নাড়িয়ে কথা বলার সুন্দর ভঙ্গিমা। এই অন্ধকার দুর্গে সেই রাজা? বন্দি ব্যাঘ্রের মতো ক্ষীণবল, নিস্তেজ। অসহ্য!

"কোনও উপায় দেবশর্মা?" কথা বললেন জয়াপীড়, প্রথম কথা। জড়িয়ে ধরলেন দেবশর্মার হাত। অপমানে উষ্ণ সে হাত, যেন মুহূর্তের মধ্যে ব্যথার বাষ্পে ভীষণ সজল হয়ে উঠল।

দেবশর্মা চাপা স্বরে বললেন, "মহারাজ, কালগণ্ডিকার ওই ওপারে আপনার সৈন্য। এই উন্মুক্ত বাতায়ন বেয়ে নেমে যান। আপনাকে পেলে তারা ত্রিভুবন জয় করবে, আজও। দেরি করবেন না রাজা!"

জয়াপীড় বেদনাহত স্বরে বললেন, "ভাবিনি ভেবেছ? কিন্তু মূর্খ নয় অরমুড়ি। এত সহজে পরিত্রাণের পথ সে খোলা রাখবে আমার জন্য? বাতায়ন পথে নামলেও কালগণ্ডিকার স্রোতে ভেসে যাব। দেবশর্মা, আত্মহত্যা করে লাভ কী? আমি বাঁচতে চাই। চাই জয়। যত সৈন্যই ওপারে থাক, দৃতি ছাড়া পারে যাওয়া যাবে না। এত উঁচু থেকে পড়লে দৃতিও ফেটে যাবে। উপায় নেই, আসলে উপায় নেই।"

দীর্ঘলালিত অসহায়তার যন্ত্রণা ফুটে ওঠে তাঁর ক্লান্ত কণ্ঠে। দেবশর্মা হঠাৎই উজ্জ্বল মুখে বললেন, "আছে রাজা, উপায় আছে।" দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর তাঁর বন্ধু তাঁরই রাজার প্রথম চাওয়া—উপায়, একটা উপায়— এটুকুও কী দিতে পারেন না দেবশর্মা?

॥ ৩ ॥

কারাকক্ষের বাইরে পদচারণা করছেন জয়াপীড়। রাজাকে উদ্ধারের উপায় অনুসন্ধানে অন্ধকার ঘরের মধ্যে ব্যস্ত তাঁর আবাল্যের সখা সুহৃদ মন্ত্রী দেবশর্মা। তাঁর রাজাকে তিনি এই কারাকক্ষ থেকে উদ্ধার করবেনই। মেলাবেন, তিনি মেলাবেন জয়াপীড়কে তাঁর দিগ্বিজয়ী সেনাদলের সঙ্গে। জবাব দিতে হবে অরমুড়িকে। কাশ্মীরকে ফিরিয়ে দিতে হবে তার প্রাণের ধন, জয়াপীড়।

আকাশে মেঘ। দুর্যোগের দিন আজ। তবু উপায় একটা আসবেই। জয়াপীড় জানেন, দেবশর্মার প্রখর বুদ্ধিমত্তা বাধা মানে না। বিশ্বাসে, ঔৎসুক্যে, আগ্রহে দুলে উঠছে তাঁর বুক। এত দিনের নিরুপায় বন্দি জয়াপীড় আজ একটামাত্র উপায়ের জন্য উৎসুক। একটিমাত্র মানুষের উপর একবুক আস্থা ঢেলে দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত জয়াপীড়। ভর দেওয়ার মতো সিংহের কাঁধটি তো এসে গিয়েছে, রয়েছে ওই ঘরের ভিতর। সময় অতিক্রান্ত। বাইরে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন দেবশর্মা। এবার অন্ধকার কারাকক্ষে পা বাড়ালেন জয়াপীড়। দেখা যাক, দেবশর্মা কতটা এগোলেন।

অন্ধকারে ঘরে পা দিয়েই অভ্যস্ত বন্দি রাজার চোখ স্থির হয়ে গেল। এ কী করলেন দেবশর্মা? কেনই বা? মেঝেতে পড়ে আছে তাঁর নিথর দেহ। শুভ্র উত্তরীয়ের প্রান্ত গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি এইমাত্র। কী যেন লেখা আছে উত্তরীয়ের ছড়ানো আঁচলে? রক্তের অক্ষর। বাম বাহুতে গভীর আঁচড়ের দাগ। রক্ত ঝরছে এখনও। নখের ডগায় রক্ত লেগে আছে ডান হাতের করাঙ্গুলিতে। রক্তের লিপিতে নখ দিয়ে লিখেছেন তিনি, 'আমি এইমাত্র মরেছি। এ শরীর এখনও বায়ুপূর্ণ। এই আপনার অভেদ্য দৃতির কাজ করবে। এই মুহূর্তে কালগণ্ডিকায় ঝাঁপ দিন মহারাজ।'

জলে ভরে গেল জয়াপীড়ের দু' চোখ। বুকের মধ্যে অসহ বেদনার তোলপাড় উঠে আসছে। ভারে ডুবছেন তিনি, ডুবে যাচ্ছেন। ভাবছেন রাজা, কাশ্মীরে বিজয়-উৎসব, জনতার উল্লাস, পুষ্পবৃষ্টি, নগরীর রাজপথে নৃত্যগীত-বাদ্যের কোলাহল। ভাবছেন, আর তাঁর দৃষ্টি হয়ে উঠছে সূচ্যগ্র। ভবিষ্যতের এই সব উজ্জ্বল ছবির সারি ধরে খুব শীর্ণ অথচ ব্যথাহত কোনও গোপন পথে যেন সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র বেয়ে এসে যাচ্ছে জল। বেদনায় টনটনিয়ে উঠছে, কেঁপে উঠছে, বুজে যাচ্ছে চোখের দু'টো মণিবিন্দু, ঝরে যাচ্ছে জয়াপীড়ের একান্ত অশ্রু। সাঁতার দিচ্ছেন জয়াপীড়, ভেসে আছেন। দু' বাহুতে যেন ছুরি বুলিয়ে দিচ্ছে কালগণ্ডিকার হিমশীতল জল। বুকের তলায় তখনও উষ্ণ স্পর্শ, তখনও বায়ুপূর্ণ শরীরের তাপ, বন্ধু, সখা, সুহৃদ, দেবশর্মা— অভেদ্য দৃতি তাঁর!

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল


গল্প: শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
বিপিনবাবুর বিপদ
ছবি: স্বপন দেবনাথ
জমজমাট রঙিন কমিক্‌স
(এ-সংখ্যায় তৃতীয় কিস্তি)
গোবিন্দ আর গোপাল একটু মুখ তাকাতাকি করে নিল।
উনি আমাদের দাদু হন। মাথায় একটু গন্ডগোল আছে, রাগ করে বেরিয়ে পড়েছেন।
নবীনের খুব মনে আছে। কিন্তু সে মুখে বলল...
একটি ঘণ্টা ভাবতে হবে।
কী গো মুদি, ভাবা হল?
মোটে তো আধ ঘণ্টা হল, তাড়া কীসের?
একটু তাড়াতাড়ি আর কষে ভাবো হে।
এক ঘণ্টা হতে আর কতক্ষণই বা বাকি!



নবীন ফিকফিক করে হেসে বলল...
তা মশাই, মাথাটা যে খাটাতে হচ্ছে তারও তো একটা পারিশ্রমিক আছে না কি?
ও বাবা, তুমি যে ধুরন্ধর লোক!
দু'টো টাকা ঠেকাচ্ছি। ওর মধ্যেই মাথাটা খাটিয়ে নাও।
পাঁচ টাকা ফেললে মনে হয় মাথাটা ডবল বেগে কাজ করবে।
একজন বৃদ্ধ এসেছিলেন সন্ধেবেলায়, একজন কৃপণ খুঁজছিলেন।
হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো সেই লোক। তা গেল কোথায় লোকটা?
আরও দু'টো টাকা।
একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে নাকি মুদির পো? আমরা কিন্তু কত্তাবাবুর পাইক।
বলছি, বলছি। তিনি ওই সাতকড়ি শিকদারের বাড়িতে উঠেছেন।
গোবিন্দ বিনা বাক্য ব্যয়ে নবীনের গেঁজেটা কেড়ে নিয়ে কষে দু' ঘা লাগাল।
তারপর গোপাল আর গোবিন্দ মুদিকে দোকানের ভিতরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দিল।


গোবিন্দ দুঃখের সঙ্গে বলল...
লোকে এত আহাম্মক কেন বলতো?
ঠিক এখন সাতকড়ির খপ্পর থেকে বুড়োটাকে চ্যাংদোলা করে কত্তাবাবুর পায়ের কাছে ফেলি।
তা ইয়ে, গেঁজের মধ্যে কত আছে দেখলে না?
গেঁজে দিয়ে তোর কী? ও তো আমার রোজগার।
কাজটা কি ভাল করলে গোপালদা?
আচ্ছা দেব'খন পাঁচ টাকা।
আহা, পুরোপুরি দশে রফা করে ফ্যালো।
কেন, তুই হলে দিতি আমাকে?
আচ্ছা তবে সাত টাকাই দিও। কাজিয়া করে লাভ নেই।
গোপালদা, কেউ আমাদের পেছু নেয়নি তো!
গোপাল পিছনের দিকে দেখে নিয়ে...
কোথায় কে?

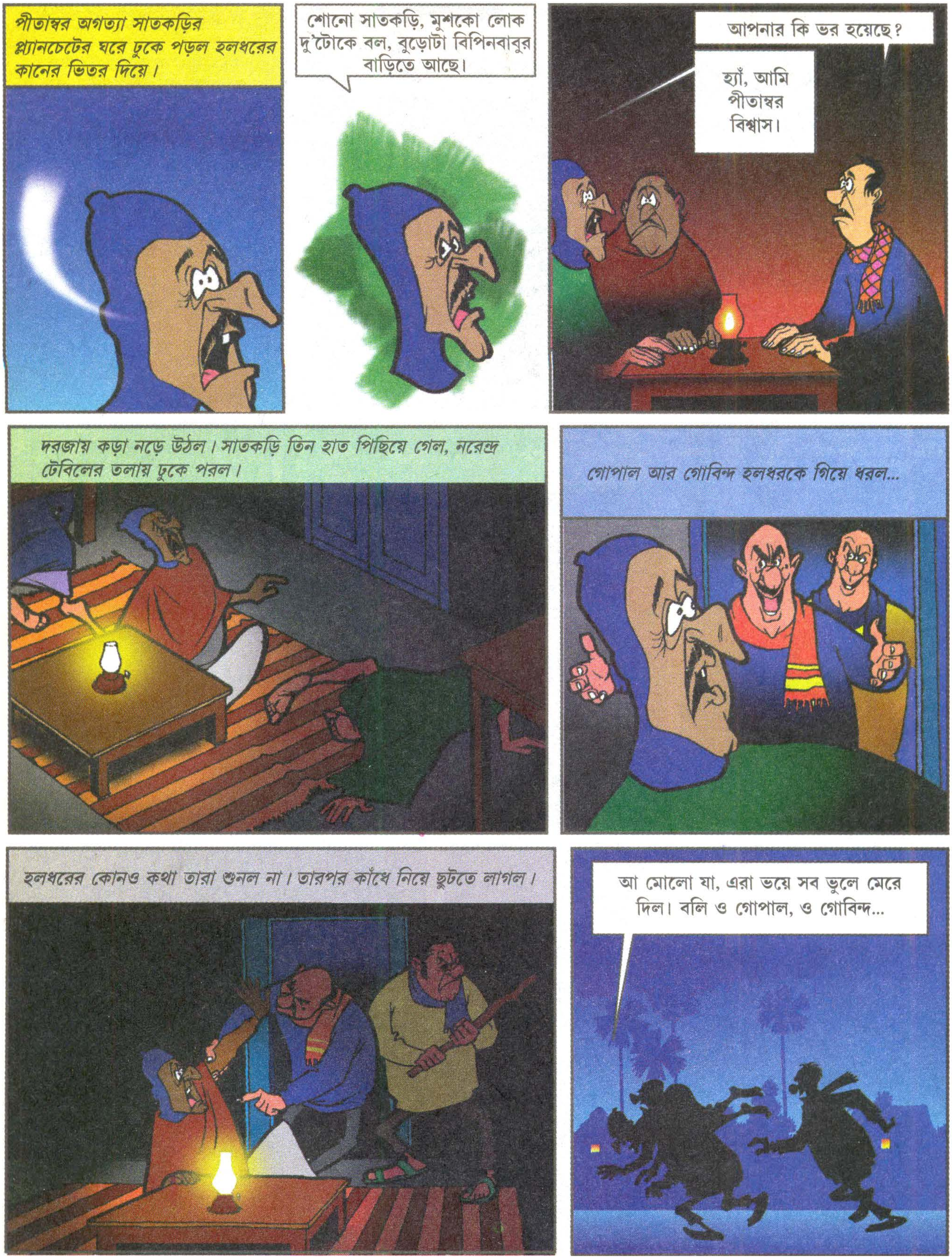

একটা বোটকা গন্ধ পাচ্ছ গোপালদা?
কই, না তো!
উহুঁ, এ যেমন-তেমন গন্ধ বলে মনে হচ্ছে না গো গোপালদা। এ যেন তেনাদের গন্ধ!
তোর মাথা!
আমার ঠাকুরদা ভূত পুষত জানো!
এত দিন পর এই প্রথম যে লোকে তাকে ভূত বলে ভাবছে পীতাম্বর এতে খুব খুশি হল।
পীতাম্বর যত দিন বেঁচেছিল, তত দিন তার খুব ভূতের ভয় ছিল।
নিজের ভয় গেলেও অন্যকে ভয় দেখানোর দুষ্টু বুদ্ধি তার মাথায় চেপে বসেছে।
কিন্তু অজানা, অচেনা, অখ্যাত ভূত হওয়া পীতাম্বরের পছন্দ নয়।

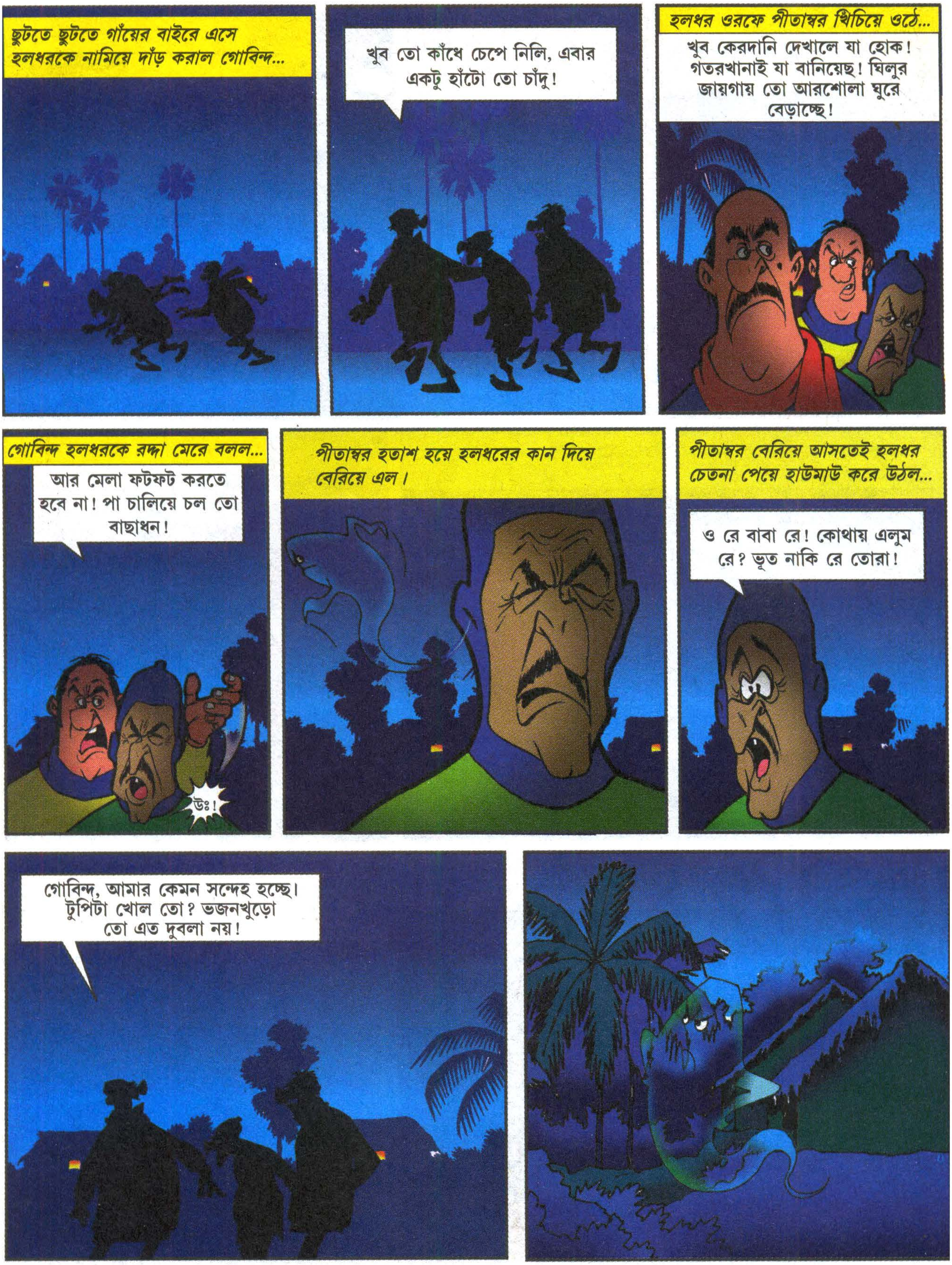

একদিন বামুন পাড়ার পুরুতমশাই পুজো সেরে ফিরছিলেন।
পীতাম্বর তাঁর সামনে লম্ফঝম্প করল।
টিকি ধরে টানল।
নিজের বিধবা বউ ও ছেলেমেয়েদের ভয় দেখানোর চেষ্টায় একটা পিতলের ঘটি বারান্দায় গড়িয়ে দিল।
বউ ভাবল, নিশ্চয়ই নচ্ছার বেড়ালটা...
গোবিন্দদের প্ল্যানচেট করার সময় আশপাশে ঘুর-ঘুর করেছে পীতাম্বর...
কিন্তু ভিতরে সেঁধোতে পারেনি।



লোকগুলো ভুল ঠিকানায় যাচ্ছে বলে পীতাম্বরের একটু দুঃখ হচ্ছিল। তাকে ভূত বলে টের পাওয়ায় গোবিন্দকে তার ভাল লেগেছিল।
লোক দু'টো ডানহাতি গলিতে ঢুকতে যাওয়ার মুখে পীতাম্বর তাদের আটকে দিল...
ও হে বাবারা, মুদি তোমাদের ভুল ঠিকানা দিয়েছে।
গোবিন্দ চাপা গলায় বলল...
একটা গলার স্বর শুনলে নাকি গোপালদা?
তোর কি মাথা খারাপ? জনমনিষ্যিহীন গলি! এখানে কথা কইবে কে?
মনে হল যেন, কেউ গলিতে ঢুকতে বারণ করছে!
পীতাম্বর আনন্দে গান গেয়ে উঠল।

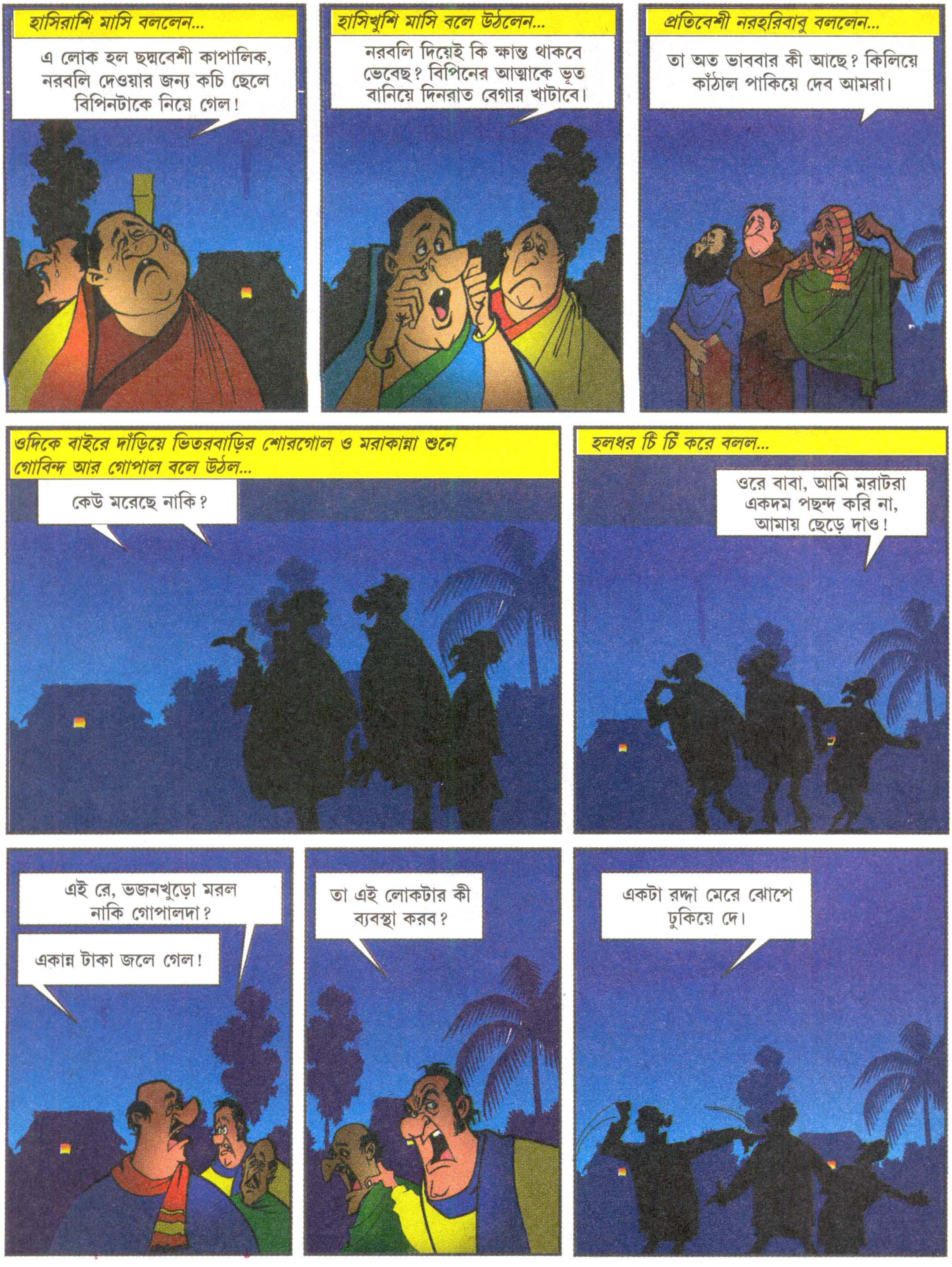

!
কে গান গাইছে?
তোর মস্তিষ্ক বিকৃতির রাজলক্ষণ।
না গো গোপালদা, কী যেন একটা হচ্ছে?
পীতাম্বর সোল্লাসে বলল...
হচ্ছেই তো, মায়া পড়ে গিয়েছে বলেই বলছি, সেই বুড়ো বিপিনবাবুর বাড়িতে উঠেছেন।
গোবিন্দ আঁতকে উঠে বলল...
ওই আবার!
একটা কাজ করবি গোবিন্দ? দু'টো মাটির ঢিপলি বানিয়ে দুই কানে গুঁজে দিই।
আমি বরং রাম নাম করি!
ওরে সর্বনাশ! ও নাম নিসনি! তা হলে আমাকে তফাত হতে হবে।
গোবিন্দ রাম নাম শুরু করল...
রাম, রাম, রাম, রাম!


পীতাম্বর অগত্যা সাতকড়ির প্ল্যানচেটের ঘরে ঢুকে পড়ল হলধরের কানের ভিতর দিয়ে।
শোনো সাতকড়ি, মুশকো লোক দু'টোকে বল, বুড়োটা বিপিনবাবুর বাড়িতে আছে।
আপনার কি ভর হয়েছে?
হ্যাঁ, আমি পীতাম্বর বিশ্বাস।
দরজায় কড়া নড়ে উঠল। সাতকড়ি তিন হাত পিছিয়ে গেল, নরেন্দ্র টেবিলের তলায় ঢুকে পরল।
গোপাল আর গোবিন্দ হলধরকে গিয়ে ধরল...
হলধরের কোনও কথা তারা শুনল না। তারপর কাঁধে নিয়ে ছুটতে লাগল।
আ মোলো যা, এরা ভয়ে সব ভুলে মেরে দিল। বলি ও গোপাল, ও গোবিন্দ...


ছুটতে ছুটতে গাঁয়ের বাইরে এসে হলধরকে নামিয়ে দাঁড় করাল গোবিন্দ...
খুব তো কাঁধে চেপে নিলি, এবার একটু হাঁটো তো চাঁদু!
হলধর ওরফে পীতাম্বর খিঁচিয়ে ওঠে...
খুব কেরদানি দেখালে যা হোক! গতরখানাই যা বানিয়েছ! ঘিলুর জায়গায় তো আরশোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে!
গোবিন্দ হলধরকে রদ্দা মেরে বলল...
আর মেলা ফটফট করতে হবে না! পা চালিয়ে চল তো বাছাধন!
উঃ!
পীতাম্বর হতাশ হয়ে হলধরের কান দিয়ে বেরিয়ে এল।
পীতাম্বর বেরিয়ে আসতেই হলধর চেতনা পেয়ে হাউমাউ করে উঠল...
ও রে বাবা রে! কোথায় এলুম রে? ভূত নাকি রে তোরা!
গোবিন্দ, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। টুপিটা খোল তো? ভজনখুড়ো তো এত দুবলা নয়!



!
আরে, এ তো আশি বছরের এক খোকা!
পাশ থেকে কে যেন বলছে...
বিপিনবাবুর বাড়ি, বিপিনবাবুর বাড়ি।
তখন থেকে কেবল শুনছি বিপিনবাবুর বাড়ি। চল তো, যাওয়া যাক।
হলধর সোজা তাদের নিয়ে গিয়ে বিপিনবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে দিল।
তিন মাসির কারও মুখে হাসি নেই! কাশীবাসী মাসি কাঁদতে-কাঁদতে বলছিলেন...
বুড়োটাকে আমি দেখেই বুঝেছিলাম, ছেলেধরা না হয়ে যায় না!


হাসিরাশি মাসি বললেন...
এ লোক হল ছদ্মবেশী কাপালিক, নরবলি দেওয়ার জন্য কচি ছেলে বিপিনটাকে নিয়ে গেল!
হাসিখুশি মাসি বলে উঠলেন...
নরবলি দিয়েই কি ক্ষান্ত থাকবে ভেবেছ? বিপিনের আত্মাকে ভূত বানিয়ে দিনরাত বেগার খাটাবে।
প্রতিবেশী নরহরিবাবু বললেন...
তা অত ভাববার কী আছে? কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে দেব আমরা।
ওদিকে বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরবাড়ির শোরগোল ও মরাকান্না শুনে গোবিন্দ আর গোপাল বলে উঠল...
কেউ মরেছে নাকি?
হলধর চিঁ চিঁ করে বলল...
ওরে বাবা, আমি মরাটরা একদম পছন্দ করি না, আমায় ছেড়ে দাও!
এই রে, ভজনখুড়ো মরল নাকি গোপালদা?
একান্ন টাকা জলে গেল!
তা এই লোকটার কী ব্যবস্থা করব?
একটা রদ্দা মেরে ঝোপে ঢুকিয়ে দে।



গোবিন্দ হলধরকে রদ্দা মেরে অজ্ঞান করে ঝোপের পিছনে টেনে নিয়ে ফেলল।
আর কত যে পাপ করব!
কী কান্না রে বাপ! চল তো, ভিতরে গিয়ে দেখি!
তিনটে যক্ষিবুড়ি কেমন সুর করে কাঁদছে দ্যাখো? ঠিক যেন কালোয়াতি গান।
বেঁটেমতো লোকটা মুখ ফিরিয়ে বলল...
আহা কাঁদবে না, বোনপোটাকে যে ছেলেধরা এসে নিয়ে যাচ্ছে।
নিয়ে গিয়েছে!
এখনও নেয়নি, তবে নেবে।
বলেন কী! ছেলেধরাটাকে ধরে...
সে উপায় নেই। তার পেল্লাই চেহারা, হাতে একখানা তলোয়ার!


বলেন কী?
মানুষ ঠাওরালে নাকি? তিনি অপদেবতা!
নন্দবাবু কত চেষ্টা করলেন, লোকটা হাওয়া হয়ে গেল!
তা ছেলেধরাটা ঘরের মধ্যে কী করছে?
বিপিনকে বস্তায় পুরে...
কিন্তু শুঁটকো বুড়োটা কোথায় গেল? যা বিবরণ শুনছি, তাতে তো এই লোক বলে মনে হচ্ছে না।
তুমি বড় আহাম্মক! গাঁয়ের লোকেরা তিলকে তাল করে।
নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস কী?
আবছা আলোতেও চিতেন দু'জন অচেনা লোককে ভিড়ের পিছন দিকটায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল।
চল, গিয়ে দেখি।


এ গাঁয়ে নতুন বুঝি!
হ্যাঁ!
আপনারা কারা?
আমি গোপাল আর ও গোবিন্দ। একজন লোককে খুঁজতে আসা। শুনলুম বিপিনবাবুর বাড়িতে থানা গেড়েছে?
কেমন লোক বলুন তো?
শুঁটকো চেহারার বুড়ো মানুষ। বয়স ধরুন হেসে খেলে দেড়শো বছর।
এত বয়স্ক লোক কোথায় পাব? সাপ্লাই নেই যে! শুঁটকো চেহারা বললেন?
খুব শুঁটকো বলতে পারেন কোথায় পাব?
কুড়ি টাকা পেলে দেখিয়ে দিতে পারি!
গেঁজে থেকে টাকাটা দিল গোবিন্দ।
কাল ভোর অবধি অপেক্ষা করতে হবে।
সে কী, আজ রাতেই ফিরতে হবে কত্তাবাবুর কাছে। মোটে একান্ন টাকা করে বন্দোবস্ত!

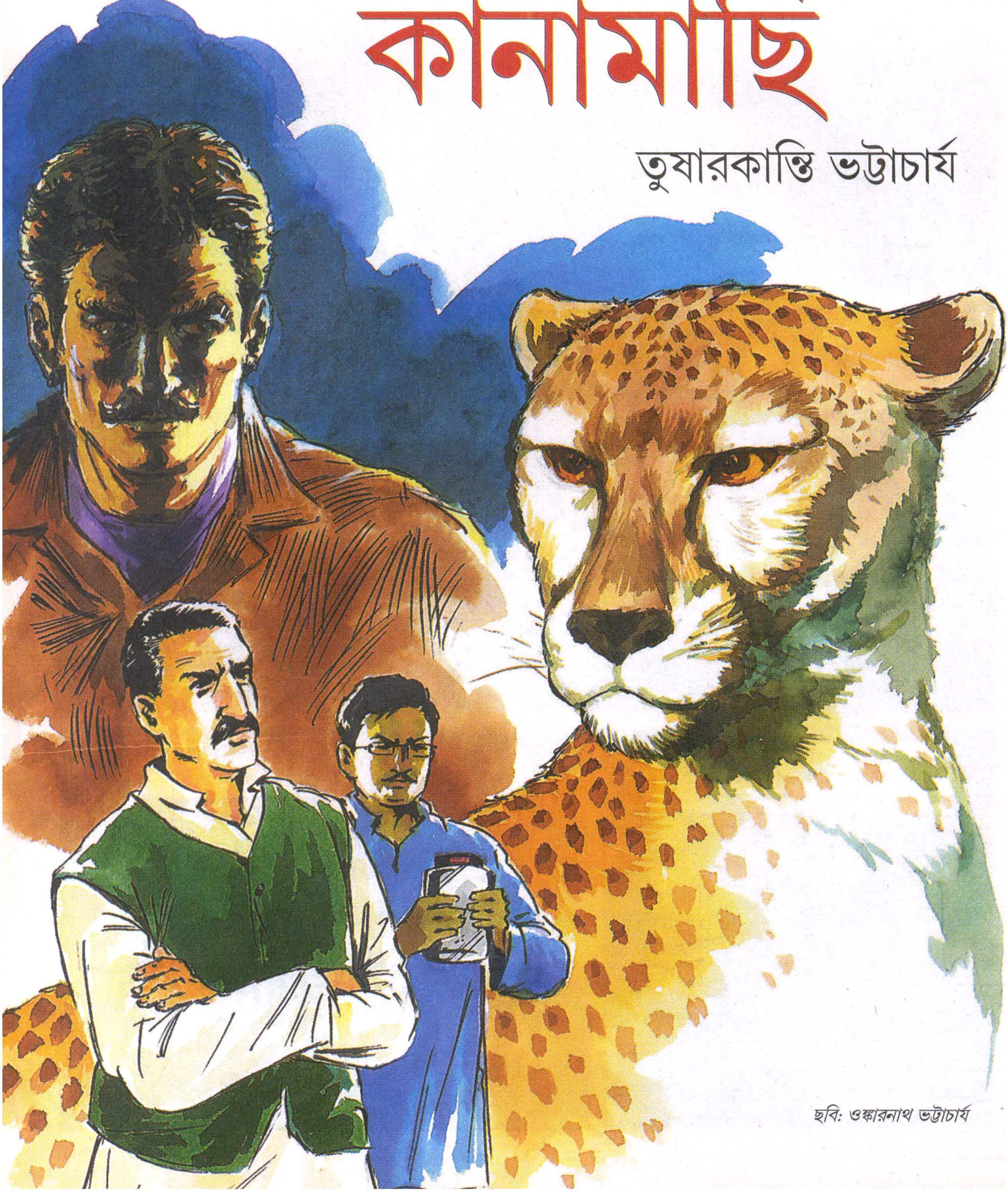

এঃ হেঃ হেঃ, আপনাদের বড্ড ঠকানো হচ্ছে দেখছি। রামভজনবাবুর বাজারদর এখন আকাশছোঁয়া!
সাত ঘড়া মোহর, সাত কলসি হিরে, মুক্তো, মানিক বলে কথা!
কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে থেকে গোপাল ফিসফিসিয়ে বলল...
কী বললেন ভাই? ঠিক শুনছি তো!
দুর, দুর! এখানে দাঁড়িয়ে কত্তাবাবুর কাজে ইস্তফা দিলাম। তুইও দিবি নাকি গোবিন্দ?
চিতেন খুশি হয়ে বলল...
বাঃ, বাঃ! চমৎকার! তা এই কত্তাবাবুটি কে?
বিদ্যাপুরের পাঁচুগোপাল। অতি বজ্জাত লোক।
হ্যাঁ, রামভজনবাবু তাকেই পছন্দ করেছিলেন। এখন বিপিনবাবুকে দেখে মত বদলেছেন।
তা রামভজনবাবু এখন কোথায়?



(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কানামাছি

তুষারকান্তি ভট্টাচার্য



ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য



"মা, চিতা কই? বাঘমামা নেই কেন?" সার্কাসের তাঁবুর ভিতর খুদে দর্শকদের এখন এটাই নিত্যদিনের প্রশ্ন। অথচ বারো দিন আগেও ছবিটা ছিল অন্যরকম।

কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে জাঁকিয়ে বসেছে 'মার্ভেলাস সার্কাস'। থাকার কথা এক মাস। দর্শকদের ভিড়ও উপচে পড়ছিল। তখন সার্কাসে হিংস্র জীবজন্তুদের নিয়ে খেলা দেখানোর এখনকার মতো সরকারি নিষেধ ছিল না। তাই এত দর্শকের ভিড়। কারণ, এক সঙ্গে এত হিংস্র পশু নিয়ে খেলা কলকাতাবাসী কোনও সার্কাসে দেখেনি। এগারোটি সিংহ, বারোটি চিতা, দশটি রয়াল বেঙ্গল এবং ছ'টি হায়েনা নিয়ে যেন একটি ছোটখাটো চিড়িয়াখানা।

এ তো গেল হিংস্র জন্তুদের কথা। এ ছাড়াও আটটি ঘোড়া, ছ'টি হাতি এবং ছ'টি গাধাও অদ্ভুত সব খেলা দেখাচ্ছে। টিয়া, বাঁদর, ভল্লুক আর শিম্পাঞ্জির কথা তো বলাই বাহুল্য। খেলাগুলো সব এমনই চিত্তাকর্ষক যে, প্রতিটি শো-ই হাউস ফুল। কিন্তু এগারো দিনের মাথায় সার্কাস কর্তৃপক্ষের মাথায় যেন বিনামেঘে বজ্রপাত। দু'টো চিতা এবং দু'টো বাঘ হঠাৎই মারা গেল পাঁচ-ছ' ঘণ্টার ব্যবধানে। পরের দিনই আরও দু'টো চিতা। কর্তৃপক্ষ দিশেহারা। প্রথমটা সন্দেহ হয়েছিল, হয়তো ফুড পয়জনিং। কিন্তু তা হলে তো অন্য জন্তুগুলোও আক্রান্ত হবে!

সার্কাস দলের কেউ-কেউ বললেন, "নিশ্চয়ই কোনও অপদেবতার কারসাজি।"

প্রোপ্রাইটার মিস বিউটি নায়ারের রাতের ঘুম ছুটে গেল। তা হলে কি সিনিয়র সদস্যদের পরামর্শ মতো শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাই উচিত? তবুও বিউটির মনে খটকা, গুপ্তহত্যা নয় তো! রাজেশ, বিক্রম ওঁরা হতাশায় এত বড় ক্ষতি করছেন না তো! নাকি টালা পার্কের 'দ্য গ্রেট মেট্রোপলিস সার্কাস' কর্তৃপক্ষ গুপ্তঘাতক লাগিয়ে এই কাজটি করছে! যে চিতার দল বিউটি নায়ারের গর্ব, সেই চিতা তো বেশিরভাগ সার্কাসে নেই বললেই চলে। আফ্রিকা থেকে কী কষ্টে, কত টাকা খরচ করে কাঠখড় পুড়িয়ে এই চিতা-পরিবার তিনি গড়ে তুলেছেন। সেই চিতার উপরই যেন খড়্গ এসে পড়েছে। আবার এটাও ঠিক, মেট্রোপলিস সার্কাসের গতানুগতিক খেলায় দর্শক আগ্রহ হারাচ্ছে। ছুটছে মার্ভেলাস সার্কাসের বুকিং কাউন্টারে। ঈর্ষা হওয়ারই তো কথা।

এমনিতে বিউটি নায়ার দৃঢ়চেতা, গুণী মহিলা। ট্রাপিজের খেলা শিখেছেন রাশিয়ায় দু' বছর থেকে। টিয়া এবং কাকাতুয়ার ইন্টারেস্টিং খেলাটি তিনিই পরিচালনা করেন। আর যে ইভেন্টটি দর্শকদের বলতে গেলে মাতিয়ে দিচ্ছে, সেই গাধাদের অঙ্ক কষা, বিউটি নায়ারেরই মাথা থেকে এসেছে। খেলাটি শুরুর আগে বিউটি ছোট্ট ভাষণ দেন। মাইক্রোফোন হাতে ওঁর সুললিত কণ্ঠে বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজিতে ঘোষণা করেন, "এই খেলা দেখার পর কোনও মাস্টারমশাই যেন কখনও অঙ্কে কাঁচা ছাত্রদের 'গাধা কোথাকার' বলে সম্ভাষণ না করেন। আর নীতিকথার গল্পে, যেমন পঞ্চতন্ত্রের গল্প বা ইশপ ফেবল্‌সে গর্দভকুলকে যেরকম নিকৃষ্টরূপে চিত্রিত করা হয়েছে, তা শুধরে দিতে শিক্ষা বিভাগ যেন উদ্যোগী হন।"

সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ হলেই দর্শকঠাসা সার্কাসের তাঁবু ফেটে পড়ে হাততালিতে। বেশিরভাগ দর্শক যেহেতু স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, হাততালি যেন থামতেই চায় না। তখন বিউটি নায়ার দর্শকদের উদ্দেশে সুন্দর ভঙ্গিমায় বাও করেন। আর এর পরেই শুরু হয় সেই মনমাতানো মজার খেলা, যার কথা বিউটি মাইকে ঘোষণা করেন—

"কঠিন অঙ্ক গোলকধাঁধা,
হাসতে-হাসতে কষবে গাধা।"

ছ'টি গাধা ততক্ষণে দর্শকদের দিকে মুখ করে পজিশন নিয়েছে। টানটান উত্তেজনা দর্শকদের মধ্যে। কারণ, কোনও-কোনও সার্কাসে কুকুর বা শিম্পাঞ্জি অঙ্ক কষলেও, গাধারা জটিল অঙ্ক কষছে, এ দৃশ্য কলকাতাবাসী দেখেনি। তাই তারা রুদ্ধশ্বাসে নীরব। এর পর আরও চমক। মাইক হাতে বিউটি ওই তিন জোড়া গাধাকে প্রশ্ন করবেন, "কী, তোমরা হাসি মুখে অঙ্ক কষতে চাও তো? গোমড়া মুখে নিশ্চয়ই নয়?"

সঙ্গে-সঙ্গে ছ'টি গাধা অট্টহাসিতে ফেটে পড়বে। আকাশের দিকে মুখ তুলে ওরা ভেঁকু-ভেঁকু শব্দে হাসতেই থাকবে। একটা বেঁটে-মোটা গাধা আবার এককাঠি সরেস। হাসতে-হাসতে গড়াগড়ি দেবে। তা দেখে ছেলে-বুড়ো দর্শকের কী হাসি! হোক না বিকট শব্দ। গাধারা যে আদৌ হাসতে পারে, এটা কী জানা ছিল?

এর পর মঞ্চে চারটি ব্ল্যাক বোর্ড আনা হবে। বিউটির নির্দেশ পেয়ে গাধাগুলো ব্ল্যাক বোর্ডের মুখোমুখি দাঁড়াবে। স্কুল পড়ুয়ার মধ্যে একজনকে বিউটি ডাক দিতেই, কে আগে আসবে এই নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বিউটি এক-একজন করে ডেকে নেন। প্রথম প্রশ্নকর্তা বোর্ডে দেবে যোগ। চার অঙ্কের যোগ। সেই প্রশ্নকর্তা বাকি তিনটি ব্ল্যাক বোর্ডের মধ্যে একটিতে লিখে দেবে সঠিক যোগফল, অন্য দু'টোতে ভুল যোগফল। ধরা যাক, আসল যোগফল ৮,০৫৬। এই উত্তরটি প্রশ্নকর্তা তার নিজের ইচ্ছেমতো তিনটি খালি বোর্ডের যে-কোনও একটিতে লিখবে, অন্য দু'টোতে ভুল উত্তর।

এবার বিউটি যে-কোনও একটি গাধাকে নাম ধরে ডাকবেন। হ্যাঁ, এ খানে বলা দরকার, প্রত্যেক গাধার বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন, মেধাবী, পারদর্শী, বুদ্ধিমান, শার্প, পারঙ্গম ও তীক্ষ্ণধী। এবং অবাক কাণ্ড, নাম ধরে ডাকামাত্রই সেই গাধা উঁচু স্ট্যান্ডে বসানো যোগ-এর সংখ্যা লেখা বোর্ডের কাছে যাবে প্রথমে। বিজ্ঞের মতো মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে যেন মনে-মনে যোগটা করে নেবে। তারপর উত্তর লেখা বোর্ড তিনটি পর্যবেক্ষণ করে, ঠিক যোগফল লেখা বোর্ডটির কাছে দাঁড়িয়ে বোদ্ধার মতো মাথা নেড়ে একটা বিকট ডাক ছাড়বে। অর্থাৎ এই উত্তরটিই ঠিক।



এখন বিউটি মাইক হাতে জিজ্ঞেস করবেন, "কী বলছ মেধাবী, এই উত্তরটা ঠিক তো?"

মেধাবী নামের গাধাটি একইভাবে কানফাটা চিৎকার করে সাড়া দেবে। অর্থাৎ, হ্যাঁ। এটাই কারেক্ট উত্তর। এইভাবে পরপর বিয়োগ, গুণ, ভাগ, সব অঙ্কেরই নির্ভুল উত্তর খুঁজে বের করবে ওরা। আর হাততালিতে কানপাতাই দায়!

সব কাগজেই মার্ভেলাস সার্কাসের জয়জয়কার। দারুণ প্রশংসা। সেই সব খবর পড়ে এবং লোকমুখে শুনে দর্শক যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। দু'-তিন বার করে আসছে সপরিবার। ভিড় সামলানোই মুশকিল হচ্ছে। প্রথম দিন নাকি গাধাদের অঙ্ক কষা দেখে খেলাটি শেষ হতেই আট-দশ বছরের একটি ছেলে গলা ছেড়ে জিজ্ঞেস করেছে, "এই ভাই বুদ্ধিমান গাধা, আমি অঙ্কে খুব কাঁচা, আমার অঙ্কের মাস্টারমশাই হবে?" তা শুনে আর-এক প্রস্থ হাসির ঢেউ।

একটি দৈনিকে লেখা হল, 'গাধা পিটিয়ে সত্যি-সত্যি যে ঘোড়া বানানো যায়, মিস বিউটি নায়ার তা করে দেখিয়েছেন।'

মার্ভেলাস সার্কাসকে শুধু ছোটখাটো চিড়িয়াখানা বললে একটু ভুল বলা হয়। বলা উচিত শিক্ষিত চিড়িয়াখানা। কারণ, সব জন্তুজানোয়ারই কম-বেশি শিক্ষিত এবং মার্জিত। আর বাঘ-সিংহের খেলাগুলো গতানুগতিক, ম্যাড়মেড়ে নয়। হান্টার মেরে এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে বসতে বাধ্য করার ট্র্যাডিশনাল খেলা নয়। প্রত্যেকটি খেলার মধ্যে বুদ্ধির ছাপ। বিউটি নায়ার মাথা খাটিয়ে সব উদ্ভাবন করেছেন। প্রচণ্ড ধৈর্য ধরে সব শেখানোও হয়েছে। দর্শকদের ভিড় তো হবেই।

যেমন সিংহের খেলাটি। একটি বাঁদর সিংহের ফেন্সিংয়ে ঢুকে সিংহদের কাতুকুতু দেবে। অমনি গোমড়ামুখো রাশভারী সিংহরা সব হেসে কুটোপাটি। পশুরাজ হাসছে, তা দেখে ফেন্সিংয়ের বাইরে থাকা পশুরা, যেমন ঘোড়া, হাতি, গাধা, সব ক'টাকে ফ্যাচর-ফ্যাচর করে হাসতে হবে। হাসবেও। নইলে পশুরাজ রেগে যেতে পারে! মাইকে এই মর্মে ঘোষণাও করা হয়।

কাতুকুতু পর্ব শেষ হলেই একটি শিম্পাঞ্জি ফেন্সিংয়ে ঢুকে উঁচু টুলের উপর বসবে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। হাতে বই এবং বেত। সিংহদের ক্লাস নিচ্ছে। মুখে বিচিত্র কিচিরমিচির শব্দ। যেন কোনও গুরুগম্ভীর বিষয় বোঝানো হচ্ছে। কয়েকটি সিংহ ঢুলবে। অমনি শিম্পাঞ্জি-স্যার হাতের বেতটা টেবিলের উপর বারকতক ঠুকবে। সিংহদের তন্দ্রা কেটে যাবে। শক্তিধর সিংহরা শিম্পাঞ্জি-স্যারের শাসন মুখ বুজে মেনে নেবে। তা দেখে আবার হায়েনার দল হো-হো (খ্যাঁক-খ্যাঁক) করে হাসবে।

আরও যে কত রকমের বিচিত্র সব খেলা! যেমন কনসার্ট ডান্স। একটি প্রকাণ্ড পিয়ানো। তার সামনে জব্বর একটা টুল। একটি সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ হাতি সেই টুলে বসে সামনের দু'টো মোটা পা দিয়ে থান ইটের মতো রিডগুলোতে চাপ দেবে। অমনই বেজে উঠবে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। আর তা শুনেই অন্য হাতি এবং ঘোড়ার দল নৃত্য শুরু করবে। দেখবার মতো দৃশ্য।

বাঘ এবং চিতাদের খেলাতেও বৈচিত্র। নো হান্টার, নো চাবুক। একটি মেয়ে ওদের ফেন্সিংয়ে ঢুকবে। একটি পেল্লাই সাইজের আয়না রয়েছে সেখানে। মাইকে ধারাবিবরণী দেওয়া হচ্ছে। মেয়েটির নাম টিঙ্কু। তার খুব তাড়া। সিনেমা দেখতে যাবে। তাই ওই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেকআপ করছে। এই সময় বাঘ এবং চিতার দল হুড়মুড়িয়ে টিঙ্কুর মেকআপ রুমে ঢুকে পড়বে। ওদেরও খুব তাড়া। আয়না দরকার, অথচ আয়না মাত্র একটি। তাই ওরা মাথা দিয়ে গুঁতিয়ে টিঙ্কুকে আয়নার সামনে থেকে সরিয়ে দেবে। টিঙ্কু বিরক্ত। বাধ্য হয়ে সে একটু সরে দাঁড়াবে। তখন বাঘবাবাজিরা আয়নার দখল নেবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাঘ এবং চিতারা নিজেদের দেখবে, কেউ ঘাড় বেঁকিয়ে, কেউ পিঠ বেঁকিয়ে, কেউ হাঁ করে। কেউ আবার জিভ বের করে। দু'-একটা বাঘ গোঁফে তা-ও দেবে সামনের থাবা তুলে। সেই সময় মেকআপম্যান একটি বাঁদর খুবই ব্যস্ত হয়ে ঢুকবে ওদের পরিপাটি করতে। টিঙ্কুর পাউডারের কৌটো থেকে পাউডার ঢালবে চিতাদের গায়ে, থুপি দিয়ে মুখেও পাউডার লাগিয়ে দেবে। এমনকী বড় চিরুনি দিয়ে ওদের টেরিও ঠিক করে দেবে।

সকলের পিছনে হেলতে-দুলতে ঢুকবে একটা বড় রয়াল বেঙ্গল টাইগার। গলায় মালা, মাথায় টোপর। শরীরে ধুতি-পাঞ্জাবি কায়দা করে পরানো। কারণ, বাঘ বাবাজির বিয়ে। অন্যরা বরযাত্রী। এই ইভেন্টটিও দর্শক মাতাচ্ছে।

পরের খেলা বাঘ এবং চিতাদের পরীক্ষা। পড়ুয়া-বাঘেরা পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষার ঘণ্টা ঢং-ঢং করে বাজবে। সব চিতা এবং বাঘ-পরীক্ষার্থীরা ছুটতে-ছুটতে ঢুকবে পরীক্ষার হলে। নির্দিষ্ট চেয়ার-টেবিল দখল করবে। শিম্পাঞ্জি-স্যার সকলের টেবিলে উত্তর লেখা প্রশ্নপত্র রাখতেই সব পরীক্ষার্থী ব্যস্ত হয়ে ঘাড় গুঁজে থাকবে। যেন কত লিখছে! একটু পরেই শিম্পাঞ্জি-স্যারকে ঢুলতে দেখেই ওরা একে অন্যের সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস করার ভঙ্গিতে মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে যেন কনসাল্ট করছে, উত্তরটা কী লেখা উচিত! গোটা হল জুড়ে বিশৃঙ্খলা। হঠাৎই স্যারের ঢুলুনি কেটে যাবে এবং বিকট চিৎকার করে ওদের শাসন করবে। তখন প্রবল শক্তিশালী বাঘেরা বাধ্য ছাত্রের মতো স্পিকটি নট! পড়ুয়ারাই শুধু নয়, অভিভাবকরাও হাসির জোয়ার তুলেছেন দর্শকের আসনে।

তা চলছিল ভালই। হঠাৎই এগারো দিনের মাথায় সেই চিতা এবং বাঘ-পরীক্ষার্থীরা জীবন সঙ্কটে পড়ে গেল। দু' দিনের মধ্যে চারটি চিতা এবং দু'টো বাঘ ইহলোক ত্যাগ করল একরকম বেমক্কাই। অন্যরা কম-বেশি অসুস্থ। কয়েকটি তো মৃত্যুর প্রহর গুনছে। তাই বিউটি ঠিক করলেন, আর দেরি নয়। এস্‌পার-ওস্‌পার করা দরকার। ছুটলেন লালবাজারে। পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়াটা আগে দরকার। কারণ, মিডিয়া যেভাবে পিছনে লেগেছে, পশুদের নিয়ে খেলা দেখানোই না বন্ধ করে দিতে হয়! যদি দেখা যায় মড়ক, তো আলাদা কথা। কিন্তু কেউ যদি সাবোতাজ করে?

॥ ২ ॥

এক মহিলা কণ্ঠ ডিসি ডিডিকে চাইলে, অপারেটর ডিডি ওয়ান অনুজ মিত্রর ঘরে লাইন দিলেন।

"হ্যালো, ইয়েস ডিসি ডিডি ওয়ান অনুজ মিত্র হিয়ার। নমস্কার, কী বললেন? মিস নায়ার? বিউটি নায়ার? মার্ভেলাস সার্কাস! হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন। চলে আসুন, ডায়েরি করেছেন? এখনও করেননি? আজ তিন-চার দিন হয়ে গেল। ফলে আমরা তো

টেকআপ করতে পারছি না। এদিকে যে তুলকালাম চলছে। আসুন, আসুন। খুবই ভাল হল, আপনি নিজেই ফোন করেছেন। না না, বেরনোর কোনও কথা নেই।"

বিউটি নায়ারের গাড়ি যখন লালবাজারে ঢুকল তখন বারোটা দশ। খোঁজখবর নিয়ে লিফটে দোতলায় উঠেই দেখলেন, বাঁ দিকে নেমপ্লেট জ্বলজ্বল করছে 'শ্রী অনুজ মিত্র'। স্লিপ পাঠাতেই সঙ্গে-সঙ্গে ডাক পড়ল ভিতরে। দু'জন ভিজিটর তখন কথা বলছিলেন। ওঁরা চলে যেতেই ডিসি বিউটির মুখোমুখি হলেন, "কী বলব ম্যাডাম, সস্ত্রীক ছেলেকে নিয়ে এক সপ্তাহ আগেই আপনার সার্কাস দেখে এলাম। কী দারুণ সব খেলা। অথচ সেই পরীক্ষার্থী বা বরযাত্রী-বাঘেরা সব মৃত্যুর কবলে!"

বিউটির চোখ ছলছল করছে। কারণ, জীবজন্তুরাই ওঁর প্রাণ। বারোটি চিতার সাতটিই জন্মেছে ভারতের মাটিতে, ওঁর সার্কাসের তাঁবুতে। তাই দু'জন পশুচিকিৎসকও সার্কাস টিমের সদস্য। চিতাগুলো আফ্রিকার জলবায়ুর প্রাণী হলেও এখানে বেশ মানিয়ে নিয়েছে। বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বিউটি বললেন, "স্যার, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কিনিয়ার নাইরোবি থেকে তিনটি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়া থেকে দু'টি চিতা আনা হয়েছিল। বাকি সাতটি ওদেরই ছেলেমেয়ে। যেমন ম্যাজেস্টিক চেহারা, তেমনই টেম্‌ড! একটি ফিমেল চিতার তিন মাস পর ছেলে বা মেয়ে হত।"

ডিসি সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বললেন, "ভেরি স্যাড! যা শুনছি, শুধু কলকাতাবাসীই নয়, দূরদূরান্ত থেকেও দর্শক আসছে।"

বিউটি বললেন, "স্যার, এইভাবে যদি প্রাণীগুলো মারা পড়ে তো শো বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকবে না! টিম খুব ভেঙে পড়েছে।"

শুনে ডিসিসাহেব হাঁই-হাঁই করে উঠলেন, "তা কেন? শো বন্ধ করা চলবে না। চালিয়ে যেতেই হবে। না হলে তা হবে আমাদেরই বদনাম। আপনি গোয়েন্দা তদন্ত চাইছেন তো?"

"ইয়েস। আই স্মেল ফাউল প্লে।"

ডিসি অনুজ মিত্রের চোয়াল শক্ত হল। বললেন, "বড্ড দেরি করে ফেলেছেন। এখনও ডায়েরি করেননি! আমরা কোনও কেসই স্টার্ট করতে পারিনি। এ নিয়ে একটু আগেই কমিশনারসাহেবের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ব্যাপারটা বিধানসভা পর্যন্ত গড়িয়েছে। আমাদের হয়েছে মুশকিল।" বলেই তিনি একটি কাগজ এগিয়ে দিলেন। "মিস নায়ার, এই কাগজে ওসি বেনিয়াপুকুর থানাকে অ্যাড্রেস করে ব্যাপারটা ডিটেল-এ লিখুন। যাদের সন্দেহ হয় তাদের নামও লিখবেন।"

বিউটি নায়ার একটু ফাঁপরে পড়লেন। টিমের যে সদস্যদের সন্দেহ হয়, তাদের নাম জড়িয়ে দিলে ভীষণ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। সার্কাসদল ভেঙেও যেতে পারে। এই আশঙ্কার কথা ডিসিকে খোলসা করে বলতে অনুজ মিত্র সন্দেহভাজনদের নাম উহ্য রাখতে বললেন। আর কথায়-কথায় জেনে নিলেন কয়েকটি নাম। তবে বিউটি যে ব্যাপারটিতে জোর দিলেন তা হল, টালা পার্কে যে দ্য গ্রেট মেট্রোপলিস সার্কাস চলছে, তাদের জেলাসির বিষয়টি। ওদের শো'গুলো বলতে গেলে শুনশান। মার্ভেলাস সার্কাসের বাম্পার ভিড় দেখে হিংসে হওয়ারই কথা। যদি কোনও এজেন্ট লাগিয়ে গুপ্তঘাতকের মাধ্যমে অ্যানিম্যালগুলোকে শেষ করে দেওয়ার প্ল্যান করে থাকে।

ইতিমধ্যে ডিসি, বেনেপুকুরের ওসি অনুপম চ্যাটার্জিকে ফোনে



ডেকে পাঠিয়েছেন। নির্দেশ মতো দু' কাপ চা এসেছে টেবিলে। কথায়-কথায় ডিসি জানতে চাইলেন, "চিতাগুলোর ডেডবডি কি ফেলে দেওয়া হয়েছে?"

বিউটি চায়ে চুমুক দিতে-দিতে বললেন, "না। যদি দরকার হয় এই ভেবে বরফের কফিনে রাখা হয়েছে। সকলে বলছিল সমাধি দিতে।"

"গুড। ওদের পোস্টমর্টেম করা জরুরি। চিড়িয়াখানার পশুচিকিৎসক দিয়েই করাতে হবে।"

হটলাইনের ফোন বেজে উঠতেই ডিসি রিসিভার তুলে বললেন, "স্যার, উনি এসেছেন। ডায়েরি করছেন, ওসিকে ডেকে পাঠিয়েছি। এখনই এসে পড়বেন।"

কিছুটা বিরক্ত স্বরে কমিশনার বললেন, "ওসি কী এই তিন দিন ঘুমোচ্ছিলেন?"

"স্যার, কর্তৃপক্ষ যদি জিডি না করে, আমরা কী করব?"

"কেন, ওসি তো সুয়োমটো কেস স্টার্ট করতেই পারত। ছ'-ছ'টি প্রাণী বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে...। যাকগে শোনো, সি এম বেশ টেনস্ড। কারণ, এই ধরনের ঘটনা গোটা কলকাতার লজ্জা। এদিকে দিল্লির সেই অ্যানিম্যাল লাভার্স ক্লাব নড়েচড়ে বসেছে। দু'-এক দিনের মধ্যে ওদের নেত্রী দলবল নিয়ে নাকি কলকাতা আসবেন। যা করার তাড়াতাড়ি করো।"

"ঠিক আছে স্যার।"

"বুঝতেই তো পারছ, মিডিয়া তিলকে তাল করছে। বিধানসভা উত্তাল।"

"কিন্তু স্যার, যদি এপিডেমিকেই ওদের মৃত্যু হয় তাতে আমাদের কী করার আছে?"

"তা হলে অন্য প্রাণী, যেমন অত সিংহ, হায়েনা, হাতি মরছে না কেন! বেছে-বেছে চিতা এবং বাঘগুলোই মরছে। আমার মনে হয় কেউ সাবোতাজ করছে। অনুজ, আমি বলছি তুমি নিজেই এই কেসটি সুপারভাইজ করো।"

"ও কে স্যার।"

রিসিভার যথাস্থানে রাখতেই ডিসি দেখলেন, ওসি বেনেপুকুর অনুপম চ্যাটার্জি দাঁড়িয়ে। কিছুদিন আগেও ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে হোমিসাইড স্কোয়াডে ছিলেন। চৌখস অফিসার, সদ্য প্রমোশন পেয়ে ওসি হয়েছেন। ওঁকে দেখেই অনুজ মিত্র দপ করে জ্বলে উঠলেন। সদ্য-সদ্য কমিশনারের উষ্মার আঁচ তখন মগজে দপদপ করছে। তাই প্রাথমিক তিরস্কারের পর্ব চলল কিছুক্ষণ। কেন তিনি তাঁর এলাকায় ঘটে যাওয়া এত মারাত্মক ঘটনায় সুয়োমটো কেস স্টার্ট করেননি। ডায়েরি না জমা পড়লেও থানার নিজের তো একটা দায়িত্ব রয়েছে।

এ ধরনের বেমক্কা ঝাপটায় অভ্যস্ত থাকলেও, অনুপম চ্যাটার্জি এই মুহূর্তে ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষ করে একজন মহিলার সামনে। আমতা-আমতা করে বললেন, "স্যার, ঘটনার মধ্যে যদি ক্রিমিনালিটির গন্ধ না থাকে, সুয়োমটো কেস হবে কী করে? তা ছাড়া স্যার, জীবনে পশুহত্যার কেস তো করিনি। হত্যা না স্বাভাবিক মৃত্যু তা-ও তো মিস্ট্রি। মানুষ বা মানুষের ক্রাইম নিয়েই তো আমাদের কারবার। আপনি নির্দেশ দিলে কেস স্টার্ট করা হবে।"

অনুজ মিত্র নিজেও এই সমস্যাটি অনুভব করেছেন। একটু সহজ হয়ে অনুপমকে বসতে বললেন। কারণ, এটা মাথা গরম করার সময় নয়। বিউটির লেখা বয়ানটি অনুপমের হাতে দিয়ে বললেন, "এটাই এফ আই আর। জিডি এন্ট্রি করে এখনই তদন্ত শুরু করে দিন। আমিও সময়মতো যাচ্ছি। চিতা এবং বাঘগুলোর ডেডবডি চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দিন। আমি ফোনে কথা বলে নিচ্ছি। যদি পয়জনিং-এর লক্ষণ পাওয়া যায়, তা হলে তো চিন্তার কিছু নেই। যদি শরীরে কোনও গভীর ক্ষত থাকে বা ডাক্তার যদি বলেন ক্ষত থেকেই মৃত্যু, তা হলে তদন্ত একটা নির্দিষ্ট সূত্র ধরে এগোতে পারবে। আর হ্যাঁ, সব সিনিয়র সদস্যর বিবৃতি বেশ গুছিয়ে লিখে নেবেন। মিস নায়ার, ওঁর সঙ্গে আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে। ভেঙে পড়বেন না, আমাদের যা করার অবশ্যই করব।"

॥ ৩ ॥

তদন্ত শুরুর আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেলেও নিট ফল শূন্য। পোস্টমর্টেম রিপোর্টও নেগেটিভ। পাকস্থলীতেও বিষক্রিয়ার কোনও সন্ধান মেলেনি, অন্তত কেমিক্যাল অ্যানালিস্টের মতে। তাই ডাক্তার সবক'টি রিপোর্টেই মত দিয়েছেন, মিস্টিরিয়াস ডেথ। ফুসফুস দুর্বল অথচ কোনও অসুখ নেই। ফলে ডিসি অনুজ মিত্র প্রায় ঠিক করেই ফেলেছেন, চিতাগুলোর মৃত্যুর কেসে ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়া হবে। অর্থাৎ তদন্ত শেষ। সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। এমনকী, কেউ যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রাণীগুলোর মৃত্যু ঘটাচ্ছে তেমন কোনও সূত্রও মেলেনি। ফলে চিতাগুলোর মৃত্যুরহস্য যে তিমিরে সেই তিমিরেই। এদিকে আরও কয়েকটি চিতা, বাঘ এবং দু'টো সিংহও ধুঁকছে। বিউটি নায়ার বস্তুত হতাশ। মানসিকভাবে বিধ্বস্তও। কারণ, পশুপ্রেমী সংস্থা ওঁকে ছেড়ে কথা বলবে না। একে তো পশুদের খাঁচায় বন্দি করে রাখা, তার উপর ওদের এই অসহায়ভাবে মৃত্যু! এত সাধের মার্ভেলাস সার্কাস দলটাই কি তা হলে ভেঙে যাবে!

ডিসি অনুজ মিত্রের এসব ভাববার অবকাশ নেই। তদন্তে যখন কিছুই বেরিয়ে এল না, ফাইনাল রিপোর্ট ছাড়া আর কিছু করার নেই। আরও কিছুদিন পর হয়তো এই ফাইনাল রিপোর্ট করা যেত। কিন্তু উঁচুমহল থেকে এমন চাপ আসছে এবং বিধানসভায় এ নিয়ে এত হইচই হচ্ছে যে, ব্যাপারটি আর নিজেদের কাঁধে অহেতুক বয়ে বেড়ানোর কোনও মানেই হয় না। ওই মিস্টিরিয়াস অসুখের অজুহাতেই তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

অনুপম চ্যাটার্জির সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা সেরে ওঁকে সঙ্গে করেই ডিসি চললেন কমিশনারসাহেবের চেম্বারে। তখন বেলা এগারোটা চল্লিশ।

সব শুনে পুলিশ কমিশনার সবিতাব্রত বসু খুশি হলেন না। এত তাড়াহুড়ো করে ব্যাপারটির নিষ্পত্তি বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। তাঁর ধারণা, সার্কাস টিমটির প্রতি হয়তো একটু অবিচারই করা হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, পশুপ্রেমী সংস্থা যেভাবে বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, তাতে এ ছাড়া হয়তো মাথা বাঁচানোর আর পথ নেই। কমিশনারসাহেব গলায় হতাশা ঝরিয়ে এও বললেন, "আসলে কী জানো অনুজ, পশুপাখির ব্যাপারে আমরা এই পুলিশের লোকেরা এক্কেবারে অনভিজ্ঞ। কিছু মামুলি সূত্র ধরে পেশাদার ক্রিমিনাল



ধরি। অবলা মূক প্রাণীর উপর কোনও নির্মম, নিষ্ঠুর ক্রাইম ঘটলে কীভাবে এগনো দরকার, সে বিষয়ে কোনও প্রশিক্ষণই আমাদের নেই। ভাবছি, আগামী কনফারেন্সে এরকম একটা প্রস্তাব রাখব।"

এই সময় কমিশনারসাহেবের ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে গম্ভীর গলায় বললেন, "হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যাঁ নমস্কার। টাটানগর থেকে? হ্যাঁ বলুন। কী নাম বললেন? গায়েন? গোবিন্দ গায়েন? হ্যাঁ, সিপি মিঃ বাসু বলছি। মার্ভেলাস সার্কাস? কেন, তা জেনে আপনার কী লাভ?"

মার্ভেলাস সার্কাস কথাটি শুনে ডিসি অনুজ মিত্র এবং তদন্তকারী অফিসার অনুপম চ্যাটার্জি যেন প্রবল ধাক্কা খেলেন। কান খাড়া করে শুনতে লাগলেন কমিশনারের ফোনালাপ।

"শুনুন মিঃ বায়েন, আচ্ছা ওই হল, মিঃ গায়েন। টাটানগরে বসে মার্ভেলাস সার্কাসের ব্যাপারে আপনার ঘুম নষ্ট হচ্ছে কেন? আর তদন্তে কেউ ধরা পড়ল কি পড়ল না, তাতে আপনারই বা কী? এসব গোপনীয় ব্যাপার!"

কমিশনারসাহেব বেশ রাগী গলায় আরও বললেন, "মশাই, আগে বলুন তো, আপনি কি সার্কাস দলের সঙ্গে যুক্ত? বা পশুপ্রেমী সংস্থার কেউ? তা যদি নন, তা হলে আপনার এত আগ্রহ কী কারণে? জোরে বলুন মিঃ গায়েন। প্রাইভেট ডিটেকটিভ? ইনভেস্টিগেটর? আই সি! আপনি কি টাটানগরেই থাকেন? গড়পারে? তাই বলুন। তদন্তের কাজে ওখানে? কীসের তদন্ত? কাকা?... আর-একটু জোরে বলুন মিঃ গায়েন। কাকা...তুয়া? কাকাতুয়ার কারসাজির তদন্ত? বলেন কী! তদন্ত শেষ? কবে আসতে চান? বেশ আসুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই শুনব। এগারোটায়।"

ফোন রেখেই অত গম্ভীর রাশভারী মানুষটি বেশ প্রাণ খুলে হাসলেন কিছুক্ষণ, "উফ, যত্ত সব পাগল! আরে বাবা, গল্পের ডিটেকটিভ আর আসল গোয়েন্দা আকাশ-পাতাল তফাত। বাস্তবের সম্মুখীন হও, বুঝবে কত ধানে কত চাল!"

ডিসি খুবই উৎসুক, "স্যার, কে উনি?"

"কে এক গোবিন্দচন্দ্র। গোবিন্দচন্দ্র গায়েন। শখের গোয়েন্দা। টাটানগরে কী এক কাকাতুয়ার কারসাজির তদন্তে গিয়েছেন। তদন্ত শেষ। আজই ইস্পাত এক্সপ্রেসে হাওড়া ফিরবেন। কাল একবার দেখা করতে চান। ওখানে কাগজে পড়েছেন এই সার্কাসের ব্যাপারটি। পুলিশ তদন্ত করছে এটা জেনেই ফোন করেছেন। কিছু বলতে চান হয়তো। যত্ত সব রাবিশ।"

অনুজ মিত্র মনে-মনে কিছু একটা হিসেব কষছেন। নামটা যেন কোথায় শুনেছেন! "স্যার, নাম যেন কী ভদ্রলোকের?"

"গোবিন্দচন্দ্র গায়েন। তাই তো বললেন। ধৃষ্টতাটা দ্যাখো। কোথাকার উটকো একটা লোক। ফোন করার সাহস দেখায় খোদ পুলিশ কমিশনারকে! কাল আসতে বলেছি। এমন কড়কে দেব না, ওই কাকাতুয়ার কারসাজির গায়েন্দাবাবাজি জীবনে ভুলবে না।"

বহুক্ষণ স্মৃতি হাতড়েও অনুজ মিত্র কিছুতেই মনে করতে পারলেন না, গোবিন্দ গায়েন নামটা কোথায় যেন...।

"আচ্ছা অনুজ, তুমি পুলিশের লোক হয়ে তুকতাকে বিশ্বাস করো?"

বড়সাহেবের এরকম প্রশ্নে অন্যমনস্কতা কাটিয়ে ডিসি বললেন, "অল বোগাস। কেন স্যার? এ কথা কেন উঠছে?"

"না, এমনই। মিসেস বলছিলেন, কেউ বাণটান মারছে। তাই বাঘগুলো মরছে। আমি অবশ্য এসব বিশ্বাস করি না। যাকগে, এখন তা হলে কী দাঁড়াল?"

কী মনে করে অনুজ মিত্র বললেন, "স্যার, আর-একটু ভেবে নিই। চব্বিশ ঘণ্টা পরে সিদ্ধান্ত নেব।"

কমিশনার হাসতে-হাসতে বললেন, "বুঝেছি। ওই গায়েন কী বলতে চায়, তা শুনে, তাই না?"

"ঠিক তাই স্যার। বলা তো যায় না। কোনও ক্লু মিলতেও পারে।"

"বেশ। তবে আমার মনে হয় না পরিস্থিতির কোনও হেরফের ঘটবে।"



নিজের চেম্বারে ফিরে অনুজ মিত্র ফের ডুব দিলেন পেন্ডিং ফাইলে। অনুপম চ্যাটার্জি বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন থানায়। ফাইলের পাতা ওলটালেও মনটা খচখচ করছে, গোবিন্দ... গোবিন্দচন্দ্র গায়েন। নামটা কোথায় যেন দেখেছেন... না কারও মুখে শুনেছেন? যতক্ষণ না মনে পড়ছে কাজে যেন মন বসছে না। কী মনে করে বাড়িতে ফোন করলেন। স্ত্রী অন্বেষাই ধরলেন। গলা শুনেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার?"

"তুমি গোবিন্দ বলে কাউকে চেনো? গোবিন্দচন্দ্র?"

"হ্যাঁ, গোবিন্দচন্দ্র ঢ্যাং তো? দুর্গাপুরে আমাদের সিটি সেন্টারের কোয়ার্টার্সের পাশেই বাড়ি। তার কথা বলছ?"

"না, না গোবিন্দচন্দ্র গায়েন।"

"গোবিন্দচন্দ্র গায়েন? গোবিন্দচন্দ্র ..."

অন্বেষা যখন ফোনে অনুজ মিত্রর সঙ্গে কথা বলছেন, ওঁদের ছেলে প্রতিভু, যার ডাকনাম বুবাই, পাশেই শুয়ে কমিক্স পড়ছিল। গোবিন্দচন্দ্র গায়েন নামটা মায়ের মুখে শুনেই সে তড়াক করে উঠে বসে মায়ের হাত থেকে রিসিভার কেড়ে নিয়ে বলল, "বাবা, তুমি কি জিজি'র কথা বলছ? সেই 'শার্লক হোম্‌সের চশমা'র জিজি?"

অনুজ মিত্রও উৎসাহে বেশ জোর গলায় বললেন, "ইয়েস। ইয়েস মাই সন। তোমার মনে আছে? উফ! কখন থেকে মনে করবার চেষ্টা করছি। কোথায় যেন ওই তদন্তের ব্যাপারে লেখা হয়েছিল? মনে আছে?"

প্রতিভু বেশ প্রত্যয়ের গলায় বলল, "কেন, ছোটদের এক পত্রিকায় এই তো বছর দু'-আড়াই আগে, মনে নেই। শার্লক হোম্‌সের সোনার ফ্রেমের চশমা চুরি গেল। সেই সঙ্গে ফেলুদার চটিজোড়াও। তোমরা পুলিশের লোক সব নাস্তানাবুদ। শেষে ওই গোবিন্দকাকু, মানে জিজিই তো সব উদ্ধার করলেন। পড়োনি?"

"পড়েছি তো! কিন্তু এই মুহূর্তে মনে পড়ছিল না। তা বুবাই, আজ তোমার স্কুল নেই?"

"বা রে, বড়দিনের ছুটি চলছে, ভুলে গেলে? আচ্ছা বাবা, জিজি'র কথা উঠছে কেন? আবার কি তোমরা কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে? জটিল কেস বুঝি?"

অনুজ মিত্র হাসলেন। বললেন, "বাড়ি ফিরে সব বলব।"

॥ ৪ ॥

আজ পাঁচ দিন হল জিজি টাটানগরে এসেছেন। সঙ্গে সহকারী ব্রীড়া অর্থাৎ ব্রীড়াবরণ বটব্যাল। ওঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে সোনারি রোডের 'আসিয়ানা গেস্ট হাউজ়'-এ। এক বিখ্যাত কোম্পানির এই বিলাসবহুল গেস্ট হাউজ়ে হেঁজিপেঁজির স্থান নেই। ওঁরা যেহেতু অম্বুজাক্ষ সিংহের আমন্ত্রণে একটি জটিল কেসের তদন্তে এসেছেন, তিনিই এখানে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। নিজে ওই কোম্পানিতে উচ্চপদে রয়েছেন। তাই এই গেস্ট হাউজ় সহজেই জিজি'র জন্য বুক করতে অসুবিধে হয়নি। তদন্তের বাকি কাজ আজই সকালে শেষ করতে পেরেছেন। তারই রিপোর্ট তৈরি করতে ব্যস্ত ব্রীড়া। ক'দিন যা ধকল গিয়েছে। তবে হ্যাঁ, অম্বুজাক্ষবাবুর জোড়া কাকাতুয়া উদ্ধারও করা গিয়েছে কাকতালীয়ভাবে।

ও হো। জটিল কেসটা কী, বলা হয়নি। জিজি এই তো মাত্র ছ' দিন আগে ওঁর গড়পারের বাড়িতে এক টেলিগ্রাম পেলেন, 'মিঃ গায়েন, প্লিজ কাম শার্প। পেয়ার অফ প্যারটস মিসিং।' সেই ডাকে সাড়া দিয়ে টাটানগরে ঘাঁটি গেড়েছেন আজ পাঁচ দিন। জিজি তাঁর দোতলার লাউঞ্জে বসে খবরের কাগজ হাতে চা খাচ্ছিলেন। দূরে দলমা পাহাড়ের রেঞ্জ। সেই অপূর্ব শোভা সত্যিই মন ভরিয়ে দেয়। অদূরে সোনারি নদী। কাকাতুয়ার কারসাজি নিয়ে গত কাল বিকেল পর্যন্ত ভীষণ ব্যস্ত। শেষে একটা পাকা লঙ্কা এবং চালকুমড়োর গায়ে পাখির নখ এবং ঠোঁটের কামড়ের সূত্র ধরে জোড়া কাকাতুয়া উদ্ধার করে অম্বুজাক্ষবাবুর হাতে তুলে দিতে পেরেছেন। তাই নিদ্রাটিও কাল রাত্তিরে হয়েছে বেশ জুতসই। আজ সারাদিনই জিজি ছুটির মেজাজে। একটু পরেই দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখতে বেরনোর কথা। অম্বুজাক্ষ সিংহের গাড়ি দশটার মধ্যেই আসবে। খাওয়ার কথা ওই কোম্পানির স্পোর্টস কমপ্লেক্স কিনান স্টেডিয়ামে, দোমোহানি যেখানে সুবর্ণরেখা আর খড়কাই নদীর সঙ্গে মিশেছে, ডিমনা লেক। জুবিলি পার্কে অবশ্য কালই যেতে হয়েছিল। আর সাঁকচি রোডের আশপাশ তো তদন্তের খাতিরেই ঘুরতে হয়েছে। ওখানেই অম্বুজাক্ষ সিংহের বাড়ি।

খবরের কাগজের পাতায় চোখ রাখলেও জিজি কিছুটা অন্যমনস্ক। দলমা পাহাড় এবং ওখানকার হাতির কথা বারবার ওঁর চিন্তায় ভিড় করছে। ভাবছেন, এমন কোনও কৌশল বের করা কি যায়, যাতে ওরা পাহাড় আর জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে আসবে না? আর তখনই একটি সংবাদের শিরোনামে জিজি'র দৃষ্টি আটকে গেল। 'মার্ভেলাস সার্কাসে মারণরোগ'। হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সংবাদটির উপর। 'কী এক অজানা রোগে মার্ভেলাস সার্কাসের চিতারা চিতপটাং হচ্ছে, তা এক রহস্য। আজ চার দিন পরেও রহস্যের কোনও কিনারা হল না। পুলিশ তদন্তের দায়িত্ব নিলেও আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। চিতা এবং বাঘগুলো দলীয় কোন্দলের শিকার কি না তাও রহস্যাবৃত। দিল্লির পশুপ্রেমী সংস্থা এ ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। দু'-এক দিনের মধ্যে পাঁচ সদস্যের দল কলকাতা আসছেন।'

সংবাদটি পড়ে জিজি ভীষণ মুষড়ে পড়লেন। শো শুরু হওয়ার দ্বিতীয় দিনেই পার্ক সার্কাস ময়দানে গিয়ে সার্কাস দেখেছেন। পশুপ্রেমী হিসেবে জিজি'র মূল আকর্ষণ ছিল চিতা, সিংহ এবং বাঘের খেলা। এত জীবজন্তু আজ পর্যন্ত অন্য কোনও সার্কাসে দেখেননি। সংবাদে বলছে, মোট ছ'টি জন্তু অর্থাৎ চারটি চিতা এবং দু'টি বাঘ মারা পড়েছে। কয়েকটি সিংহ এবং অন্য চিতাগুলোও ধুঁকছে।

না! পশুতত্ত্ববিদ রিউবেন ক্যাস্টাংয়ের শিষ্য হয়ে গোবিন্দ গায়েনের চুপ করে বসে থাকা শোভা পায় না। সুদূর আফ্রিকার চিতাগুলো এভাবে বেঘোরে মারা পড়বে, আর জিজি এসি গাড়িতে করে বেড়াবেন, তা হয় না। ব্রীড়াকে ডেকে বললেন, "সব প্রোগ্রাম বাতিল। আজই ব্যাক টু কলকাতা।" খবরের কাগজটি বাড়িয়ে দিলেন ব্রীড়ার হাতে। বললেন, "মার্ভেলাস সার্কাসের সংবাদটি পড়ো।" তারপর পুলিশ কমিশনাকে ফোন করলেন। পাঁচ-ছ'বার চেষ্টা করেও কলকাতার সংযোগ পেলেন

না। ব্রীড়াকে বললেন, "চেষ্টা চালিয়ে যাও।"

অন্য একটি ফোনে অম্বুজাক্ষবাবুর সাঁকচি রোডের বাড়িতে ফোন করে জিজি টুর প্রোগ্রাম ক্যানসেল করলেন। বললেন, "আজই 'ইস্পাত এক্সপ্রেস' ধরে হাওড়া ফিরতে চান। খুবই জরুরি। সেইমতো যেন টিকিটের ব্যবস্থা হয়।"

রিপোর্ট লেখার ফাঁকে-ফাঁকে ব্রীড়া এসটিডির চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। শেষে যখন লাইন পাওয়া গেল তখন বেলা পৌনে বারোটা। খোদ কমিশনারসাহেবকে লাইনে পেয়ে জিজি দ্বিগুণ উৎসাহে জানালেন তাঁর ইচ্ছের কথা। কিন্তু কমিশনারসাহেবের নির্লিপ্ত ব্যবহারে জিজি খুবই আপসেট। রিসিভার রেখে মনে-মনে খুবই দুঃখ পেলেন। উচ্চপদে আছেন বলে এত দেমাক! তিনি তদন্তে পুলিশকেই সাহায্য করতে চান। কৃতিত্ব যা পাওয়ার পুলিশই পাবে। তবুও কেন এমন রুক্ষ ব্যবহার?

যাক! মান-অভিমান বড় কথা নয়। এখন লক্ষ্য অন্য প্রাণীগুলোকে বাঁচানো। আর যদি কোনও গুপ্তঘাতক প্রকৃতির এই অনবদ্য সৃষ্টি চিতাগুলোকে মেরে ফ্যালে, তাকে খুঁজে বের করা।

বেলা তিনটে নাগাদ অম্বুজাক্ষবাবু সস্ত্রীক এলেন জিজিকে বিদায় জানাতে। সঙ্গে পল এবং নোরা নামের কাকাতুয়া দম্পতিও, যাদের গত কালই উদ্ধার করতে পেরেছেন জিজি এবং ব্রীড়া। জিজিকে দেখামাত্রই পল নামে কাকাতুয়াটি চিৎকার করে বলতে শুরু করল, 'জিজি খুব পাজি, জিজি খুব পাজি। পাজি খুব জিজি।'

আর কাকাতুয়া-গিন্নি নোরা ব্যঙ্গ করল ব্রীড়াকে, 'ব্রীড়ার ক্রীড়া খতম, ব্রীড়ার ক্রীড়া খতম।'

অম্বুজাক্ষবাবুর স্ত্রী ওদের খুব ধমক দিলেন। কিন্তু জিজি বেশ মজা পাচ্ছেন।

॥ ৫ ॥

ঠিক এগারোটাতেই জিজি স্লিপ পাঠালেন। কমিশনারসাহেব হাজারও ব্যস্ততায় গোবিন্দ গায়েনের নামটাই ভুলে গিয়েছেন। কিন্তু নীচে লেখা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। তখনই গত কালের ফোনালাপ প্রসঙ্গটি মনে পড়ে গেল। আরদালিকে বললেন, ডেকে আনতে।

"নমস্কার স্যার, আমি গোবিন্দ। গোবিন্দচন্দ্র গায়েন। সংক্ষেপে জিজি। কাল টাটানগর থেকে ফোন করেছিলাম। আর ইনি হচ্ছেন আমার সহকারী ব্রীড়া। ব্রীড়াবরণ বটব্যাল। আপনি বিবিবি বা বিবি বলেই ডাকবেন।"

গোটা কলকাতার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে যাঁর চিন্তা, সেই কমিশনারসাহেবের এই রকম খেজুরে আলাপের সময় থাকার কথা নয়। এই সব উটকো লোককে একটু লাই দিলেই মাথায় চড়বে। তার উপর পোশাকের যা ছিরি! কাঁচাপাকা কদমছাঁট চুল। বিশাল নাকটি যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ঠোঁটের উপর। পাকা গোঁফটি ঝুলন্ত নাকটিকে কোনওক্রমে ঠেলে আছে উপরে। এ নাকি প্রাইভেট ডিটেকটিভ! কী গালভারী কথা!

সবিতাব্রত বসু মানুষটি এমনিতে রাশভারী। মনে-মনে ভীষণ বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বললেন না। মুখে আরও গাম্ভীর্য মাখিয়ে গম্ভীর গলায় বসতে বললেন।

"দেখুন মিঃ..."

"আজ্ঞে, গোবিন্দচন্দ্র গায়েন। সংক্ষেপে জিজি।"

"হ্যাঁ, মিঃ গায়েন। কিছু মনে করবেন না। বেশিক্ষণ সময় দিতে পারব না। এখনই সিএম-এর কাছে যেতে হবে।"

"আজ্ঞে, ক'টায়?"

"বারোটায়। কিন্তু তাই বলে এক ঘণ্টা সময় দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, বলুন ওই মার্ভেলাস সার্কাসের ব্যাপারে কী জানেন? কী-ই বা বলতে চান?... আচ্ছা এক মিনিট, ডিডি-ই কেসটা দেখছেন। ডিসি ডিডিকে ডেকে নিই। যা বলার ওঁর সামনেই বলুন।"

কমিশনারসাহেব ইন্টারকমে অনুজ মিত্রকে ডেকে নিলেন। অনুজ মিত্র বেলা এগারোটা থেকেই এই রকম একটি ডাকের অপেক্ষায় ছিলেন। কারণ, গত রাতে ছেলে প্রতিভূ সেই ছোটদের পত্রিকার পুরনো সংখ্যাটি বের করে দেখিয়েছে। প্রায় দু' বছর পরে 'শার্লক হোম্সের চশমা' ফের পড়েছেন। শুধু তা-ই নয়, ছেলে একটি 'প্রকৃতিপ্রেমীর ডায়েরি'ও ওঁকে পড়িয়েছে। সেখানে গোবিন্দ গায়েন একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, 'রিউবেন ক্যাস্টাং ও আমি'। দারুণ সব তথ্যে ঠাসা। সেখানে জিজি লিখেছেন, কীভাবে পশুপাখিদের সঙ্গে ভাব জমাতে হয় তা নমস্য পশুতত্ত্ববিদ রিউবেন ক্যাস্টাংসাহেব ওঁকে হাতে ধরে শিখিয়েছেন। প্রায় পাঁচ বছর কেটেছে পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন জঙ্গলে। অনেক চিতা, ভল্লুক এবং সিংহের সঙ্গেও খুব সহজে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলেন।

এই সব তথ্য জানার পর অনুজ মিত্রর ধারণাটাই পালটে গিয়েছে। জিজি এলেবেলে মানুষ নন। যথেষ্ট এলেমদার। আর সেই জন্যে অপেক্ষায় আছেন, কখন উনি কমিশনারসাহেবের কাছে আসবেন আর বড়সাহেব কখন ডেকে পাঠাবেন। কেসটিতে ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়া আপাতত মুলতুবি রেখেছেন। দেখাই যাক না জিজি'র মতটা কী?

ডাক পেয়ে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ছুটলেন বড়সাহেবের ঘরে। ঢুকেই কানে এল বড়সাহেবের রুক্ষ গলা, "দেখুন মিঃ গায়েন, আমরা তো আর আপনাদের মতো শখের গোয়েন্দা নই। জীবন তুচ্ছ করে...এই তো অনুজ, এসো, এসো। মিট মিঃ গোবিন্দচন্দ্র গায়েন। সংক্ষেপে জিজি। আর উনি মিঃ বিবিবি। ব্রীড়াবরণ বটব্যাল।" বলেই একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন।

অনুজ মিত্র বস্তুত অবাকই হলেন। মোস্ট আন-ইমপ্রেসিভ চেহারা। অনেকটা যাত্রাদলের ভাঁড়ের মতো। লোকটার সত্যিই কি কোনও এলেম আছে? না স্রেফ ভাঁওতাবাজি।

কমিশনারসাহেব কাজের মানুষ। ফালতু কথায় সময় নষ্ট করার পাত্র নন। তাই সরাসরি কাজের কথা পাড়লেন। কথার মধ্যে শ্লেষ মাখিয়ে বললেন, "মিঃ গায়েন, বলুন তো ওই চিতার চিতপটাংয়ের ব্যাপারে আমাদের কীভাবে হেল্প করতে চান?"

জিজি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁর আগেই অনুজ মিত্র বললেন, "দেখুন মিঃ গায়েন, কাল আপনার ফোন পেয়ে আমার মনে হচ্ছিল, মানে কমিশনারসাহেব যখন ফোনে কথা বলছিলেন, কোথায় যেন আপনার কথা পড়েছি বা দেখেছি। তারপর আমার ছেলে প্রতিভূ গড়গড় করে বলে গেল আপনার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য। তখনই মনে পড়ল শরদিন্দু মঞ্চে সেই বিশ্ব গোয়েন্দা সম্মেলনের কথা। শার্লক হোম্সসাহেবের সোনার ফ্রেমের চশমা আপনি যেভাবে কাকের বাসা থেকে উদ্ধার করে পুলিশের মুখ রক্ষা করেছিলেন তা ভোলবার নয়। ইনফ্যাক্ট, সেই সময় আমি ডিসি ইএসডি। মঞ্চে উপস্থিত ছিলাম তাবড়-তাবড় গোয়েন্দাদের চোখে দেখব বলে। সেদিন মাত্র কয়েক মিনিট দূর থেকে দেখেছি



আপনাকে।"

জিজি বিগলিত। বললেন, "আমি যে কাকের চরিত্র জানি। তাই ওটা সম্ভব হয়েছিল।"

সঙ্গে-সঙ্গে ব্রীড়া মনে করিয়ে দিলেন, "আর ফেলুদার চটিজোড়াটার কথাও বলুন।"

ডিসি অনুজ মিত্র বললেন, "হ্যাঁ, তা-ও মনে আছে... আচ্ছা মিঃ গায়েন?"

"বলুন স্যার।"

"রিউবেন ক্যাস্টাংসাহেবের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ আছে?"

"নেই আবার? এই তো গত মাসেও দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। বারবার ফোনে ডাকছেন। কামপালার জঙ্গলে আর-একটা অ্যাডভেঞ্চার করতে চান। বুঝতেই পারছেন, বয়স হয়েছে তো! এই বয়সে আর সুদূর উগান্ডা যেতে মন চাইছে না।"

কমিশনারসাহেব তো থ'! বলে কী লোকটা! এতক্ষণ চিনতে পারেননি! তবে কতটুকু সময় আর ওঁকে দেখেছেন? মঞ্চে যখন এরকুল পোয়ারো, শার্লক হোম্‌স, ওয়াটসন, ব্যোমকেশ, ফেলুদা এসে বসেছেন, তখনই ঘোষণা করা হল, 'হ্যাঁ, শার্লক হোম্‌সের চশমা এবং কাঠমান্ডুতে কেনা ফেলুদার চটিজোড়াও পাওয়া গিয়েছে।' তখন... হ্যাঁ, বেশ মনে পড়ছে, গোবিন্দ গায়েন নামে একজনকে মঞ্চে হাজির করা হল। তিনি নিজে শার্লক হোম্‌সের হাতে তাঁর চুরি যাওয়া সোনার ফ্রেমের চশমাটি, আর ফেলুদার হাতে তাঁর চটিজোড়াটিও তুলে দিলেন। হ্যাঁ, আরও মনে পড়ছে। শার্লক হোম্‌স জিজি'র সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন করতে-করতে উচ্ছ্বাসে বারবার বলছিলেন, "গোবিন্দ, ইউ গট ইট অ্যাট লাস্ট।" সেই ছবি পরদিন সব খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল প্রথম পাতায়। আর সেই লোকটাকেই এখন চিনতে না পেরে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছিলেন! ছিঃ ছিঃ! জিজিকে চিনতে তাঁর ভুল হল! অথচ সেই সময়টা গোটা কলকাতা শহর উত্তাল। শার্লক হোম্‌সের চশমা উধাও! পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজেও যা উদ্ধার করতে পারেনি, সামান্য এক অজ্ঞাতপরিচয় মানুষ তা পেরে সকলের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে। লজ্জায় তখন মাথা কাটা গেলেও কলকাতাবাসীর মানসম্মান রক্ষা পেয়েছিল এই মানুষটিরই দৌলতে। উনি তখন জয়েন্ট সিপি। তা হলে তো এই লোকটা পারবে। পারবে চিতা আর বাঘের মৃত্যুরহস্য উদ্ধার করতে।

কমিশনার সবিতাব্রত বসু বেশ লজ্জায় পড়ে গেলেন। তাচ্ছিল্যের সুর উধাও। কফি আনবার নির্দেশ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কালই টাটানগর থেকে ফিরেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। পরশু বিকেলের মধ্যেই উদ্ধার হয়ে গেল কিনা!"

"কী উদ্ধার হল?" ডিসি এবং সিপি একসঙ্গে বলে উঠলেন।

"কাকাতুয়া দম্পতি।"

"তার মানে?"

"একজোড়া কাকাতুয়া মিসিং ছিল। অম্বুজাক্ষবাবুর শখের কাকাতুয়া। মালয়েশিয়া থেকে আনা।"

"তা উদ্ধার হল কীভাবে?"

"সে অনেক কথা। এক দিন বলব সময় করে। তবে মোদ্দা কথা, ওটা ছিল ওই কাকাতুয়াদের কারসাজি। স্রেফ একটা পাকা লঙ্কার সূত্র ধরে...।"

ব্রীড়া ভুলটা শুধরে দিয়ে বললেন, "সেই চালকুমড়োর ক্লুটাও বলুন। সেই যে ওদের নখ আর ঠোঁটের কামড়ের চিহ্ন ধরে...।"

জিজি নিজের ভুল শুধরে নিয়ে গুছিয়ে বলতে যাবেন, কমিশনারসাহেবের ফোন বেজে উঠল। স্বভাবতই কাকাতুয়ার কারসাজির প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। কমিশনারসাহেবের গলা বেশ উদ্বিগ্ন। শুধু শোনা গেল, "কালই?" রিসিভার রেখে বেশ হতাশার সুরে বললেন, "শোনো অনুজ, কাল সকাল দশটা পঞ্চাশে রাজধানী এক্সপ্রেসে পশুপ্রেমী সংস্থার নেত্রী মিস বিপাশা কাউর পাঁচ সদস্যের টিম নিয়ে হাওড়া পৌঁছচ্ছেন। এবার সামলাও! আমাদের ব্যর্থতা গোটা দেশ জানবে। মিডিয়া তো মুখিয়েই আছে। কী করবে? ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে হাত ধুয়ে নেবে, নাকি আর-একটু দেখবে?"

জিজি হাঁই-হাঁই করে উঠলেন। বললেন, "এত হুটহাট কেসটা গুটিয়ে নেওয়া ঠিক হবে না। আরও দু'টো দিন দেখাই যাক না।"

অনুজ মিত্র তো ঠিকই করেছিলেন আরও একটু দেখবেন। কারণ, পশুপাখির ব্যাপারটি গোবিন্দবাবু ভালই বোঝেন। এখন খোদ বড়সাহেবও সেই সুরে সুর মিলিয়ে যেন তা-ই চাইছেন। বললেন, "ঠিক আছে মিঃ গায়েন। আমরা আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা দেখব। এখন বলুন... হ্যাঁ অনুজ, ওঁর হাতে কেস ডায়েরির কপি দেওয়ার ব্যবস্থা করো। উনি পিএম রিপোর্ট খুঁটিয়ে দেখুন। এসব দেখেশুনে যদি ওঁর মনে হয়, আমরা একচক্ষু হরিণের মতো দিশেহারা, কোনও বিশেষ দিক তদন্তে এড়িয়ে গিয়েছে, তখন দু' দিন অপেক্ষা করা যেতে পারে। আসলে কী জানেন মিঃ গায়েন?"

"বলুন স্যার।"

"পুলিশের তদন্ত তো কিছু মামুলি সূত্র ধরে এগোয়। আর বেশিরভাগ ক্রাইম তো মানুষজন সম্পর্কিত। পশুপাখিদের বিরুদ্ধে কোনও ক্রাইম ঘটলে পুলিশ খুবই অসহায়। ভালই হল, আপনি নিজে এগিয়ে এসে হাল ধরতে চেয়েছেন। পারিশ্রমিকের ব্যাপারটি আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।"

জিজি আবেগে আপ্লুত, "দেখুন স্যার, এই অবলা প্রাণীদের উপর কেউ নির্মম ব্যবহার করে পার পেয়ে যাবে, এ আমি বরদাস্ত করব না। ক্যাস্টাংসাহেবের শিষ্য হয়ে আমি চুপ করে বসে থাকতে পারব না। পারিশ্রমিকের কথা আমার মাথায়ও আসেনি।"

কফির কাপে চুমুক দিতে-দিতে কমিশনারসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ গায়েন, ওই ক্যাস্টাংসাহেব, যাঁর কথা অনুজও একটু আগে বলল, উনি আসলে কে?"

শেষ চুমুক দিয়ে জিজি বললেন, "মিঃ রিউবেন ক্যাস্টাং। ভদ্রলোক আমেরিকান, পশুপাখিই ছিল ওঁর গবেষণার বিষয়। ঘটনাচক্রে ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। ওঁর ক্ষমতা দেখে আমি তো তাজ্জব হয়ে যাই।"

"যেমন?" কমিশনারসাহেবের কৌতূহলে জিজি শ্রদ্ধা মেশানো গলায় স্মৃতির দরজায় যেন টোকা দিয়ে বললেন, "ট্রান্সভালের জঙ্গলেই বলুন, আর দার-এস-সালামের জঙ্গলেই বলুন। হাতের রাইফেল কদাচিৎ ব্যবহার করতেন। যখনই ভল্লুক, চিতা বা সিংহের মুখোমুখি হয়েছেন, ভয় তো দূরের কথা, জিভের ডগা দিয়ে তালু স্পর্শ করে এক-এক ধরনের বিচিত্র শব্দ করতেন। ব্যস।"

"তার মানে?" ওঁদের দু'জনের প্রশ্ন।



"তার মানে কেল্লা ফতে। ওই সব হিংস্র জন্তু কুঁইকুঁই শব্দ করতে-করতে পিছু হটে গা-ঢাকা দিত।"

"বলেন কী!"

"কতবার ভল্লুক হয়তো তেড়ে আসছে। ক্যাস্টাংসাহেব জিভের কৌশলে শুধু উচ্চারণ করলেন, 'পর-র-র, চট চ-ট'। অমনই ভল্লুকবাবাজি ছুটে এসে ক্যাস্টাংসাহেবের হাত চেটে দিল। অর্থাৎ বন্ধুত্ব পাতানো হয়ে গেল।"

"এ তো অবিশ্বাস্য!"

জিজি গর্বের হাসি হেসে বললেন, "এ সবই আমার নিজের চোখে দেখা।"

বলেই জিজি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ডিসি এবং কমিশনারসাহেব কিছু বোঝার আগেই জিজি জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। "একটা জিনিস দেখুন স্যার। বিরক্ত হবেন না। মাত্র দু' থেকে তিনবার একটু শব্দ করব। তারপর খেলাটা দেখুন।"

বলেই জিজি অদ্ভুত কুশলতায় এক ধরনের আওয়াজ করলেন মুখে। শব্দ তেমন উচ্চগ্রামেও নয়। কিন্তু সেই বিচিত্র স্বরক্ষেপণের প্রভাব যে এত সুদূরপ্রসারী হতে পারে, সিপি বা ডিসির ধারণার বাইরে!

মুহূর্তের মধ্যে অন্তত যাট-সত্তরটি কাক কা-কা করে লালবাজার চত্বর মাতিয়ে তুলল। আসছে, আরও কাক আসছে। দেখতে-দেখতে সংখ্যাটা অন্তত দু'শো ছাড়াল। কিছু দুঃসাহসী কাক কমিশনারসাহেবের দোতলার ঘরের জানলায় বসে উঁকিঝুঁকি মারা শুরু করল। এদিকে কাকের মিছিল আসছে তো আসছেই। সিপির ঘরের ছ'টি জানলাতেই তিলধারণের জায়গা নেই। এত কাক! যেন কাকে-কাকে কাকময়।

এবার জিজি খুবই মৃদু স্বরে কেমন ঘড়ঘড় আওয়াজ তুললেন। অবাক কাণ্ড! প্রায় দশ-বিশটি কাক জিজির শরীরের বিভিন্ন অংশের দখল নিল। দু' হাতে, দু' কাঁধে, ঘাড়ে, মাথায় চুপচাপ এসে বসল এবং ঘনিষ্ঠ হয়ে আদর করতে শুরু করল। যেন কত দিনের চেনা! কত দিন পরে দেখা!

কমিশনারসাহেব এবং ডিসি বিরক্ত হওয়া তো দূরের কথা, বিস্ময়ে হতবাক! এরকমও হয়!

এদিকে কাকের বিচিত্র চিৎকারে আশপাশের বিল্ডিং থেকে পুলিশ কর্মীরা কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে দেখছে, হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, এত কাক এল কোত্থেকে? আর সেই গুচ্ছের কাক ভিড় জমাচ্ছে মেন বিল্ডিংয়ে খোদ সিপির ঘর লক্ষ করে। রাইফেলধারী পুলিশ কর্মীরা পজিশন নিয়ে দাঁড়াল। শুধু আদেশের অপেক্ষা। কোনও অত্যুৎসাহী পুলিশকর্মী গুলি ছুড়ে বসতে পারে ভেবেই জিজি আর কালক্ষেপ না করে এক পাঁচমিশেলি শব্দ করলেন তিনবার। শব্দটা কিছুটা চাপা। গুমরে-গুমরে বের হল কণ্ঠ আর তালু স্পর্শ করে।

দুই পুলিশ কর্তা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলেন, ঘরের এবং জানলায় বসা কাকের ঝাঁক মুহূর্তে যেন হাওয়া। কৌতূহল চাপতে না পেরে কমিশনারসাহেব পিছনের জানলার পাশে উঠে এলেন। দেখতে চাইলেন বাকি কাকেরা কোথায়?

কোথায় কাক? শুধু তাঁর কর্মীরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে তাঁরই ঘর লক্ষ করে। একটা কাকেরও নামগন্ধ পর্যন্ত নেই। এ তো অদ্ভুত মিরাকল!

অন্য পদস্থ অফিসাররা ইতিমধ্যে বড়সাহেবের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে। কমিশনার তাঁদের আশ্বস্ত করে বিদায় করলেন, "না চিন্তার কিছু নেই।"

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘরের মধ্যে। সাহেবরা চুপ। তা লক্ষ করে জিজি ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "স্যার, রাগ করলেন?"

এমন রাশভারী মানুষটি গাম্ভীর্যের খোলস ছেড়ে প্রবল হাসিতে ফেটে পড়লেন, "রাগ! কী যে বলেন মিঃ গায়েন! আসলে বিস্ময়ের ঘোরটা এখনও কাটেনি!"

ডিসি অনুজ মিত্র বললেন, "কী অবিশ্বাস্য প্যারাডক্স! একশো রাউন্ড গুলি খরচ করেও যা ছিল অসম্ভব, সেই দুরূহ কাজ সম্ভব হল আশ্চর্য শব্দপ্রয়োগে! রিয়েলি অ্যামেজিং!"

জিজি বিজ্ঞের মতো বললেন, "আসলে স্যার, শব্দ হচ্ছে ব্রহ্ম। ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেও যা সম্ভব নয়, মধুর স্নেহক্ষরা শব্দব্রহ্মে তা সম্ভব অনায়াসে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)



টিনটিনের কোন গল্পের অ্যাডভেঞ্চার মারলিনস্পাইক-এ? কার কাছে হেরে চোখের জলে টেনিস ছাড়লেন আন্দ্রে আগাসি? কোন ইংরেজি শব্দের শেষ চারটি অক্ষর বাদ দিলেও উচ্চারণ একই থাকে? এরকম নানা ধরনের প্রশ্ন নিয়েই এবারের কুইজ়।

কু ই জ়

১ মহাত্মা গাঁধীকে 'জাতির জনক' আখ্যা দিয়েছিলেন কে?

২ ১৭২২ সালের ৫ এপ্রিল, জ্যাকব রজেভিন নামের এক ওলন্দাজ কী আবিষ্কার করেন?

৩ কোন বিখ্যাত ফুটবলারকে 'R-10' লেখা কানের দুল পরতে দেখা যায়?

৪ ইংরেজিতে কোন শব্দের শেষ চারটে অক্ষর বাদ দিলেও উচ্চারণ একই থাকে?

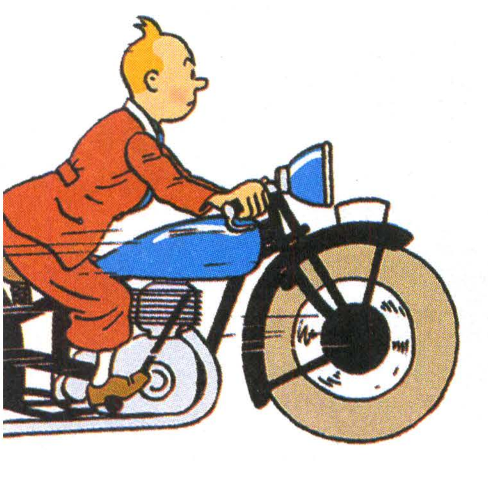
৫ টিনটিন নানা দেশে তার অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে বিখ্যাত। বলতে পার টিনটিনের কোন গল্পের পুরোটাই মারলিনস্পাইক-এ হয়েছিল?

৬ বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল শহর টোকিও। দ্বিতীয় স্থানে আছে মেক্সিকো সিটি। এই তালিকায় তৃতীয় স্থানটি একটি ভারতীয় শহরের। কোন শহর?

৭ টেনিস দুনিয়ার এক বর্ণময় চরিত্র আন্দ্রে আগাসি সম্প্রতি অবসর নিলেন। শেষ ম্যাচে কার কাছে হেরে যান তিনি?

৮ কোন বিখ্যাত গানে প্রথম সুর দিয়েছিলেন যদুনাথ ভট্টাচার্য অথবা পণ্ডিত যদুভট্ট?

অভিজিৎ সুকুল
তনুশঙ্কর চক্রবর্তী



গত সংখ্যার উত্তর

১. ভাইস অ্যাডমিরাল রামদাস কাতকারি।
২. নৌবাহিনীর সাবমেরিনের নাম।
৩. এইচ এম এস হারমিস।
৪. আই এন এস ইন্ডিয়া।
৫. আই এন এস নেতাজি সুভাষ।
৬. বিশাখাপত্তনম।
৭. চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী।
৮. একমাত্র পালতোলা ট্রেনিং জাহাজ।

জবাব চাই

১. ২০০৫-০৬ সালের 'রাজীব গাঁধী খেলরত্ন পুরস্কার' পেয়েছেন কে?
২. ডাবলসে কাকে সঙ্গী করে ২০০৬ সালের ইউ এস ওপেন জেতেন লিয়েন্ডার পেজ়?
৩. ফিদেল কাস্ত্রোর নাম কোন দেশের সঙ্গে জড়িত?
(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার জবাব চাই-এর উত্তর

১. সাদা।
২. ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজ়েশন।
৩. কার্ল মার্কস।

সঠিক উত্তরদাতা

অরিত্র মুখোপাধ্যায়, নবম শ্রেণি, বাঁশবেড়িয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, হুগলি; **আনন্দরূপ চক্রবর্তী,** ষষ্ঠ শ্রেণি, কৃষ্ণপুর আদর্শ বিদ্যামন্দির; **দীপান্বিতা সেনগুপ্ত,** পঞ্চম শ্রেণি, শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন, সল্টলেক; **প্রাঞ্জল দাশগুপ্ত,** সপ্তম শ্রেণি, অতুলমণি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, খড়্গপুর, পূর্ব মেদিনীপুর; **অনির্বাণ দৈত্যারী,** নবম শ্রেণি, এ কে ঘোষ মেমোরিয়াল স্কুল, কলকাতা; **জীবন দাস,** দ্বাদশ শ্রেণি, গঙ্গারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়, দক্ষিণ দিনাজপুর; **কথা ঘোষ,** সপ্তম শ্রেণি, মাখলা দেবীশ্বরী বিদ্যানিকেতন, হুগলি; **শুভ্রজ্যোতি চৌধুরী,** ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া; **দেবায়ন মৈত্র** (ই-মেল মারফত); **অনুরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,** সপ্তম শ্রেণি, হাওড়া জিলা স্কুল, হাওড়া; সাগ্নিক বিশ্বাস, চতুর্থ শ্রেণি, নারায়ণপুর এফ পি স্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা; **সৃজন ভারতী দাস,** ষষ্ঠ শ্রেণি, ডন বস্কো, ব্যান্ডেল, হুগলি; **মির মহম্মদ মাসুদ,** নবম শ্রেণি, বর্ধমান মিউনিসিপাল হাই স্কুল, বর্ধমান; **অর্কদীপ মারিক,** নবম শ্রেণি, মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবন, পশ্চিম মেদিনীপুর; **অচিন্ত্য বারুড়ি,** একাদশ শ্রেণি, শ্রীরামপুর হাই স্কুল, হুগলি; **সৈকত ঘোষ,** অষ্টম শ্রেণি, নারকেলডাঙা হাই স্কুল; **সোহম তরফদার,** অষ্টম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা; **অর্চিষ্মান মজুমদার,** দশম শ্রেণি, হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিশন, হাওড়া; **অভিরুদগত মাজি,** দশম শ্রেণি, তালজংরা উচ্চ বিদ্যালয়, বাঁকুড়া।

আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীতে আমরা পাঠকদের কাছ থেকে কুইজ়ের উত্তর চেয়েছিলাম।

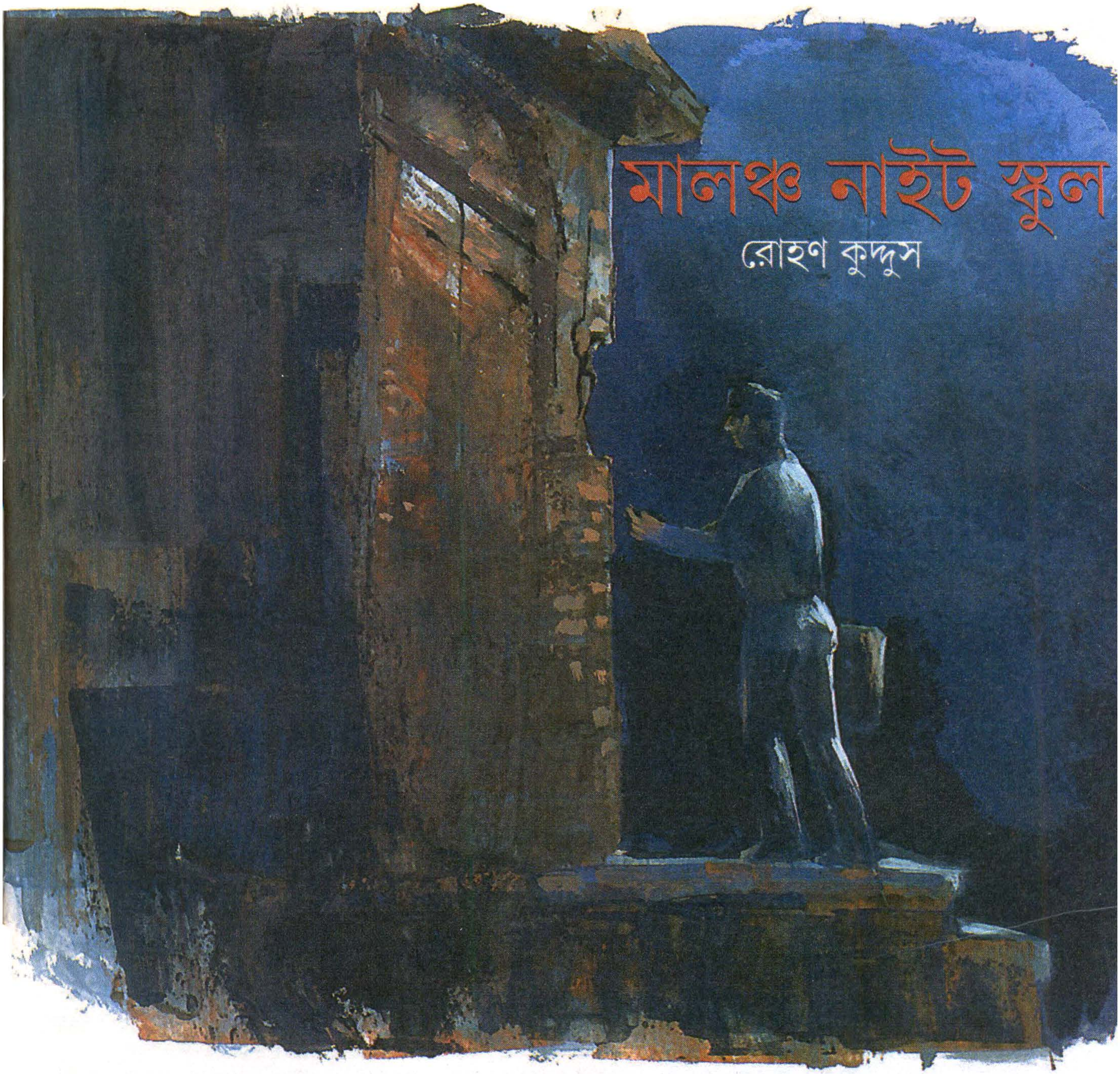
উত্তরগুলো নীচে দেওয়া হল:

ইতিহাস- ইস্তাম্বুল
বই- মান্না দে
ইনফোটেক- মডিউলেটর ডিমডিউলেটর
বেড়ানো- হগওয়ার্ট এক্সপ্রেস
জাতীয় সঙ্গীত- ভারত ও বাংলাদেশ
প্রাণীজগৎ- অদ্বৈত
বিনোদন- শ্রেয়াস তলপাড়ে
কলকাতা- কলকাতা
পুরাণ-ভীম
খেলার জগৎ- লিয়েন্ডার পেজ়

সঠিক উত্তরদাতার নাম:

অপরূপ আইচ, একাদশ শ্রেণি, বাণীভারতী, রিষড়া, হুগলি; **চন্দ্রোদয় চট্টোপাধ্যায়,** নবম শ্রেণি, স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল, কলকাতা।

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
আনন্দমেলা, জবাব চাই,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১।
ই-মেল
anandamela@abpmail.com



মালঞ্চ নাইট স্কুল

রোহণ কুদ্দুস

মাধ্যমিক শেষ হওয়ার পরের দিনই বাপ্পা সিদ্ধান্ত নিল, 'টিউশনি পড়াব এবং নিজের হাতখরচ নিজে উপার্জন করব।' বাপ্পার দাদা বছরখানেক হল চাকরিতে ঢুকেছে। মাস গেলে মাইনের টাকায় রেস্টুরেন্টে বাপ্পাকে নিয়ে গিয়ে ইচ্ছেখুশি খাওয়াদাওয়া করে এবং বাবাকে লুকিয়ে একটা মোটা টাকা হাতখরচও তার হাতে গুঁজে দেয়। সেই টাকায় বাপ্পা তার প্রাণের বন্ধু নীলু আর পলাশকে নিয়ে এনতার ফুচকা আর আলুকাবলি খায়। তাই ওরা এখন বাপ্পাকে আগের চেয়ে একটু বেশিই সমীহ করে চলে।

এহেন অবস্থায় ছেলে পড়ানোর সিদ্ধান্তটা একটু যেন কেমন-কেমন। তবু দাদার পয়সায় আয়েশ করার চেয়ে নিজের কষ্টার্জিত অর্থে মজা করার আনন্দ বোধ হয় অন্যরকম। টিউশনির মাইনের টাকায় কী কী করবে, তার একটা লিস্টও বাপ্পা মনে-মনে তৈরি করতে লাগল। কিন্তু শুধু কল্পনার বেলুনে ফুঁ দিয়ে লাভ নেই। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বলেও তো একটা ব্যাপার আছে।

তাই এক রবিবার সকালে লুচি আর আলুরদম খাওয়ার পর বাপ্পা কথাটা সাহস করে দাদাকে বলেই ফেলল। দাদা তখন কী একটা কাজ করছিল কম্পিউটারে। বাপ্পার কথা শুনে আনমনে বলল, "টিউশনি করবি? তা কর না। ভালই তো!" তারপর একটু থেমে বলল, "এখন কী সব আইন হয়েছে না টিউশনির মাস্টারদের জন্য? যা করবি সাবধানে করিস।"

উঃ! দাদাকে নিয়ে আর পারা যায় না! ইশকুলের টিচারদের নিয়ে বিধিনিষেধের কথা চাপিয়ে দিল প্রাইভেট টিউটরদের ঘাড়ে। বাপ্পা তাই আর কথা না বাড়িয়ে মানে-মানে সেখান থেকে কেটে পড়ল।

এবার টার্গেট বাবা। দাদা না হয় বলে দিল 'ভালই তো', কিন্তু আসল ভয় তো বাবাকে নিয়েই। কেন যেন মনে হচ্ছিল, বাবা কিছুতেই রাজি হবেন না। বাড়ির ছোট ছেলে হওয়ার অপরাধে তাকে নিয়ে মায়ের একটা পুতুপুতু ভাব তো আছেই। বাবাও কম যান না। এই তো লাস্ট বড়দিনে তাদের ইশকুলের সকলে মজা করে গাদিয়াড়া বেড়িয়ে এল। কিন্তু সাঁতার জানে না বলে বাপ্পার যাওয়া হল না। অবশ্য তার বদলে তাকে নিয়ে বাবা-মা-দাদা সকলে আরও একবার সায়েন্স সিটি গিয়েছিলেন। কিন্তু ইশকুলের বন্ধুদের সঙ্গে গাদিয়াড়া, আর বাড়ির সকলের সঙ্গে সায়েন্স সিটি, কোনও তুলনা হয়?

যাই হোক, বাপ্পা গুটিগুটি পায়ে বারান্দায় এসে হাজির হল। ছুটির দিনে বাজারটাজার সেরে এসে বাবা এখানেই বসেন। তখন বাবার জলখাবারের লাস্ট স্টেজ চলছে, মানে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে একবার চায়ে চুমুক দিচ্ছেন, আর-একবার কাগজে চোখ রাখছেন। বাপ্পা গিয়ে সামনে দাঁড়াল, "বাবা।"

বাবা পা নাচানো বন্ধ করে মুখের সামনে থেকে কাগজটা সরালেন। মেজাজটা বোধ হয় একটু খুশিখুশি ছিল। তাই একগাল হেসে বললেন, "আরে, বাপ্পাবাবু যে, কী খবর? জলখাবার খেয়েছেন?"

বাপ্পা মাথা নাড়িয়ে 'হ্যাঁ' জানাল।

এবার বাবা একটু সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু বলবেন মনে হচ্ছে?"

বাপ্পা একটু ভয়ে-ভয়েই কথাটা ভাঙল। তা বাবা যে এমন সহজভাবে মেনে নেবেন, তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। আপত্তি তো দূরের কথা, উলটে তিনি যেন একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

কাগজটা মুড়ে টিপয়ের উপর রেখে একটু সোজা হয়ে বাবা শুরু করলেন, "জানিস, তোর দাদু তখন সবে রিটায়ার করেছেন। সংসারের ইনকাম বলতে বাবার পেনশনের সামান্য কিছু টাকা আর বড়দার চাকরিটা। আর পাঁচটা প্রয়োজন মিটিয়ে আমাদের চার ভাইয়ের লেখাপড়ার খরচ সামলাতে তোর জেঠুর তখন হিমশিম অবস্থা। আমি কিন্তু কারও মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকিনি। খবরের কাগজ ফিরি করতাম বাড়ি-বাড়ি। তখন ক'টা বাড়িতে আর কাগজ নিত! তাই গোটাকুড়ি বাড়িতে কাগজ পৌঁছে দিয়ে রেল স্টেশনেও ঘুরতাম। ভোর চারটে থেকে উঠে সকাল ন'টা সাড়ে-ন'টা পর্যন্ত ওই কাগজের পিছনেই কেটে যেত। তারপর ইশকুলে যাওয়া। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতাম দু'টো বাড়িতে পড়িয়ে। তারপর নিজে যখন পড়তে বসতাম, তখন দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসত। তবু জোর করে জেগে থাকতে হত। ওই কাগজ বেচার পয়সা আর টিউশনির মাইনে থেকে নিজের কলেজের ফিজ় রেখে বাকিটা তুলে দিতাম মায়ের হাতে। সেসব যে কী দিন গিয়েছে...!"

বাবা চশমাটা খুলে কাচ দু'টো মোছার অছিলায় বোধ হয় চোখও মুছে নিলেন আড়ালে। এসব কথা বাবার মুখে অনেকবার শুনেছে বাপ্পা। অনেক কষ্ট করে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে বাবা আজ একটা সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন। চশমাটা আবার চোখে লাগিয়ে নিয়ে বাবা বললেন, "টিউশনি করবে, ভাল কথা। কিন্তু মাথায় রেখো, এর জন্য যেন লেখাপড়ার ক্ষতি না হয়। এমন তো নয় যে, হাতখরচের টাকা জোগাড় করতে তোমাকে টিউশনি করতে হবে? তবু স্বাবলম্বী হওয়া ভাল। আর প্রথম মাইনেটা মায়ের হাতে তুলে দিও। ওতে তোমার মঙ্গল হবে।"

বাপ্পার হঠাৎ নিজেকে একটু বড়-বড় মনে হল। বিজয়া ছাড়া বাবাকে প্রণাম করা হয় না। তাই এখন প্রণাম করলে ব্যাপারটা অতি ভক্তি মনে হতে পারে। এই সব সাত-পাঁচ ভেবেই মনে-মনে সে বাবাকে একটা প্রণাম করল। মাকে অনেক কিছুই কিনে দেওয়ার প্ল্যান করেছে সে। তবে একেবারে প্রথমেই আছে, কাচের চুড়ি। কে জানে কেন, মায়ের কাচের চুড়ি পরার খুব শখ। কিন্তু বাবার পছন্দ নয় বলে কোনও দিন কিনতে পারেন না। তাই বাপ্পা ঠিক করেছে, প্রথম মাসের মাইনেটা পেলে বাবাকে লুকিয়ে সে মাকে এক বাক্স নানারঙের কাচের চুড়ি কিনে দেবে। মোড়ের 'নিবেদিতা স্টোর্স'-এ বিক্রি হয়, সে দেখেছে।

যাই হোক, বাড়ি থেকে পারমিশান যখন পাওয়া গেল, তখন এর পরের ধাপ নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করা উচিত। পড়ানোর জন্য ছাত্র সে পাবে কোথায়? এ তো আর কলকাতা শহর নয়। কার মুখে যেন বাপ্পা শুনেছিল, কলকাতায় পড়ানোর জন্য ছাত্রের অভাব হয় না। কিন্তু তাদের মতো এই আধা শহরে কাকে সে পড়াবে? এবার একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল বাপ্পা।

॥ ২ ॥

বিকেলে ওরা গঙ্গার হাওয়া খেতে-খেতে বাদামভাজা খাচ্ছিল। ওরা মানে তিন বন্ধু—বাপ্পা, নীলু আর পলাশ। কাল রাতে পলাশের একটু পেটের গন্ডগোল হয়েছিল, তাই ফুচকা খাওয়া আজকের মতো বাতিল। বাদাম শেষ করে বাপ্পা ওদের কাছে তার সমস্যার কথাটা পাড়ল। শুনেই নীলুর হ্যা হ্যা হাসি, "তুই ছেলে পড়াবি?" তারপর বাপ্পার থমথমে মুখ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, "সিরিয়াসলি?"

পলাশ এসব ব্যাপারে ভাল পরামর্শ দেয়। ও একটু ভেবে বলল, "আমার মনে হয় খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের কলামে চোখ বোলানো ভাল। ওখানে প্রাইভেট টিউটরের জন্যে অ্যাড দেয়।"

এটা এতক্ষণ বাপ্পার মাথায় আসেনি। যাক, সমস্যার একটা সমাধান পাওয়া গেল। আনন্দে বাদামওয়ালাকে ডেকে ও আরও তিন ঠোঙা বাদাম নিল।

পরের ক'টা দিন পলাশের কথামতো বাপ্পা কাগজের বিজ্ঞাপনগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। পরের বুধবার একটা বিজ্ঞাপন নজরে এল। ক্লাস ফাইভের ছাত্রকে পড়ানোর জন্য গৃহশিক্ষক দরকার। সঙ্গে ফোন নম্বরও দেওয়া আছে। বাপ্পা ফোন করল। ওদিকে একজন ভদ্রমহিলা তুললেন ফোনটা, বোধ হয় ছাত্রের মা। বাপ্পা বিজ্ঞাপনের কথাটা বলল।

"ও আচ্ছা। তা আপনি কী করেন?"

"আমি এবার মাধ্যমিক দিয়েছি।"

"মাধ্যমিক?"

ভদ্রমহিলার গলার স্বর শুনে বাপ্পার মনে হল, মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া একটা বড়সড় অপরাধ।

"মানে তুমি এত ছোট... কী করে পড়াবে?"

'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে আসায় বাপ্পা অপমানিত বোধ করল। তবু আত্মপক্ষ সমর্থন করে সে বলল, "আমি



গল্প

কিন্তু টেস্টে এইট্টি নাইন পার্সেন্ট পেয়েছি।"

দু' পার্সেন্ট বাড়িয়েই বলল। যদি লাভ হয়, এই ভেবেই ছোট্ট করে মিথ্যেটা বলে ফেলল সে।

কিন্তু চালাকি দিয়ে মহৎ কাজ হয় না। বিবেকানন্দের বাণী। ছাত্রের অভিভাবিকা অনড়, "শুধু মার্কস দিয়েই কি হয়? পড়াতে গেলে অভিজ্ঞতাও তো দরকার। তুমি আগে কখনও পড়িয়েছ?"

আশ্চর্য যুক্তি! পড়াতে গেলে অভিজ্ঞতাই আসল? তা হলে যাঁরা এত দিন ধরে পড়াচ্ছেন, সেই সব মাস্টারমশাই কি পড়ানোর প্রথম দিন থেকেই অভিজ্ঞতা নিয়ে শুরু করেছিলেন? কিন্তু এসব যুক্তি কে শোনে? বাপ্পার তো এখনও ভাল করে দাড়ি-গোঁফ বেরোয়নি। 'বাচ্চা ছেলে', 'অনভিজ্ঞ' ইত্যাদি বলে বোধ হয় পড়াতেই দেবে না কেউ কোথাও। তার উৎসাহ আর কল্পনার ফানুসটা আস্তে-আস্তে চুপসে যেতে থাকল।

॥ ৩ ॥

"আরে ধুর! এক জায়গায় না বলল আর তুইও হাল ছেড়ে দিলি?" পলাশ চোখ নাচিয়ে বলল, "আমার ছোটকা পড়ানোর জন্য মাস্টার খুঁজছে। মাধ্যমিক শেষ হতে আমাকেও ধরেছিল ক'দিন।"

"তো?"

"তো কী? আমি 'না' বলে দিয়েছি। বাবা একটা নতুন গেম কিনে দিয়েছেন পরীক্ষা শেষ হতেই। সেটার পিছনে সময় দেব, না ছেলে পড়াব? তুই-ই বল।"

"তা তোর ছোটকা কি মাস্টার খুঁজে পেয়েছে?"

"না বোধ হয়। তুই আজ সাড়ে চারটের মধ্যে আমাদের বাড়ি চলে আয়। আমি ছোটকাকে বলে রাখব।"

বাপ্পা উৎসাহ আর আনন্দে পলাশকে জড়িয়ে ধরে বলল, "থ্যাঙ্কস রে! কালই তোকে কবিরাজি কাটলেট খাওয়াব।"

পলাশ হাত ছাড়িয়ে বলল, "দাঁড়া-দাঁড়া। অত লাফাস না। টাকাপয়সা কিন্তু নামমাত্র দেবে।"

॥ ৪ ॥

রেল স্টেশন থেকে বাড়ি দশ মিনিটের পথ। অফিসের ব্যাগটা হাতে নিয়ে অন্য দিনের মতোই বাড়ি ফিরছিলেন বাপ্পার বাবা। কিন্তু ক' পা হাঁটার পরেই ঝপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল। চেনা রাস্তা, তার উপর রাস্তার আশপাশের দোকান থেকে ঠিকরে পড়া আলোও আছে। তাই পথ চলতে অসুবিধে হল না। হঠাৎ একটা ছেলে ব্যস্তভাবে তাঁকে পাশ কাটিয়ে সামনের একটা বাড়িতে ঢুকে গেল। সেই অস্পষ্ট আলোতেও চিনতে ভুল হল না, ও হল বাপ্পা। গায়ের জামাটা দেখেই চিনেছেন তিনি, গত বছর পুজোয় কিনে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু বাপ্পা ওই বাড়িতে ঢুকল কেন? গত শীতেই পুলিশ ওই বাড়ি থেকে ক'জন সমাজবিরোধীকে পাকড়াও করেছিল। শুনেছেন, বাড়ির মালিক কলকাতায় থাকেন, তাই ফাঁকা বাড়ি পড়ে থাকলে যা হয় আরকি। আশঙ্কায় গুড়গুড় করে উঠল বুক। ছাত্র পড়ানোর নামে বেরিয়ে বাপ্পা এই বাড়িতে এসে কী করছে? আজ এক সপ্তাহ হতে চলল। তিনি অফিস থেকে ফেরার আগেই বাপ্পা বাড়ি থেকে টিউশনি পড়াতে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসার পরেও সে কোথায় পড়াতে যায়, কাকে পড়ায়, এসব তিনি কিছুই জিজ্ঞেস করেননি। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কী করবেন সাত-পাঁচ ভাবছেন, তারই মধ্যে সন্দেহজনক চেহারার আরও কয়েকজন লোককে তিনি ঢুকতে দেখলেন। এদের মধ্যে একজনকে তিনি চিনতেও পারলেন। লোকটা এই রাস্তায় রিকশা চালায়। নাম লক্ষ্মী। কিন্তু এরা কী করছে এখানে?

পায়ে-পায়ে অন্ধকার বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। অন্ধকারে আন্দাজে দরজা ঠেলে ঢুকলেন। অন্ধকারটা চোখে সয়ে যেতে বুঝলেন, সামনেই একটা সিঁড়ি। তার বেশ কয়েক জায়গায় ইট বেরিয়ে গিয়েছে। উঠতে গিয়ে অন্ধকারে দু'বার ঠোক্করও খেলেন। দু'-তিনটে ধাপ যখন বাকি, তখন উপর থেকে বাপ্পার গলা পেলেন, 'এটা হল আ-কার। ক-এর পাশে বসলে হবে কা। ক-এ আকার ক, কাক।' ঘরের ভিতর হ্যারিকেন জ্বলছে দু'-তিনটে। সামনে চটের উপর ছড়িয়েছিটিয়ে বসে আছে দশ-বারোজন লোক। সকলেই এই এলাকার খেটেখাওয়া মানুষ। তাদের সামনে একটা রংচটা ব্ল্যাকবোর্ডে বাপ্পা গোটা-গোটা অক্ষরে লিখে চলেছে। ঘরের একটা দেওয়ালে অপটু হস্তাক্ষরে আলকাতরা দিয়ে মোটা-মোটা করে লেখা 'মালঞ্চ নাইট স্কুল'। সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই চশমা খুলে চোখ মুছলেন বাপ্পার বাবা। এমন আনন্দের স্বাদ জীবনে খুব বেশি তো আসেনি!

দরজার উলটো দিকে মুখ করে বোর্ডে লিখছিল, তাই বাপ্পা জানতেও পারল না, সেই মুহূর্তে এক গর্বিত পিতা সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলেছেন। অন্ধকারে পথ চলতে তাঁর একটুও কষ্ট হচ্ছে না।

ছবি: সুব্রত চৌধুরী

রামকৃষ্ণ মিশন সেন্টিনারি প্রাইমারি স্কুল

(বরানগর, কলকাতা)



আমাদের স্কুল

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৯৮ সালের ৮ মে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজির উপস্থিতিতে আমাদের স্কুলের যাত্রা শুরু হয়। এখন আমাদের স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৮০০। এই স্কুলে প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। স্বামী বিবেকানন্দর মানবগঠনমূলক শিক্ষার আদর্শে তৈরি এই স্কুল প্রকৃত শিক্ষাদানের মাধ্যমে আমাদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে কয়েকটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করে। এর মধ্যে রয়েছে, (ক) আমাদের মন শুদ্ধ করে তোলা, (খ) প্রাচীন ভারতের আশ্রমিক আদর্শ আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক বিশ্বের উপযোগী করে তোলা, (গ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বোধের সার্থক সমন্বয়ের রসায়ন আমাদের চেতনায় সংস্থাপন করা, (ঘ) আমাদের প্রত্যেককে দৃঢ়চিত্ত করে তোলা এবং (ঙ) আমাদের সামনে 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু'-র উপনিষদধর্মী শিক্ষার আদর্শ তুলে ধরা।

বিদ্যার্থী ব্রত

বিদ্যালয়ে প্রতি বছর নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্ররা প্রকৃত বিদ্যার্থীর আদর্শ জীবনচর্যার ব্রত গ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানের নাম 'বিদ্যার্থী ব্রত'। এই অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে হোমাগ্নিতে বেলপাতা অর্পণ করে ছাত্ররা।

ধ্যানের অনুশীলন

প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমিক আদর্শে তৈরি এই বিদ্যালয়ে আমরা আমাদের মনঃসংযোগ বাড়ানোর জন্য ধ্যানের অভ্যেস অনুশীলন করি। এর জন্য রয়েছে একটি ধ্যানকক্ষও।

খেলার আসরে

মনের গঠনের সঙ্গেই শরীর গঠনের উদ্দেশে খেলার মাঠেও আমাদের সাবলীল উপস্থিতি। ক্রীড়াঙ্গনেও আমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠতার নজির রাখতে সব সময় চেষ্টা করি।

প্রদর্শনী

বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসবে আমরা বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করি। এই ধরনের শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর মাধ্যমে বইয়ে পড়া বিষয়বস্তুর ধারণার যথার্থ প্রয়োগ হয়।

স্বদেশপ্রেম

জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রতি বছর আমরা স্বাধীনতা দিবস পালন করি। শুধু তাই নয়, বছরের বিভিন্ন সময় নানা অনুষ্ঠানেও মেতে উঠি আমরা।

লেখাগুলো লিখেছে

ঋতম মল্লিক, অভিজিৎ সাহা *(দ্বিতীয় শ্রেণি)*, **শুভদীপ সরকার, দীপন বণিক, আবির সরকার, অনির্বাণ নাথ, সায়ক মজুমদার, রৌণক মুখোপাধ্যায়** *(তৃতীয় শ্রেণি)*, **আয়ুষ্মান মালাকার, প্রণীত দত্ত** *(চতুর্থ শ্রেণি)*

ঘোষণা

নিজেদের স্কুলকে দেখতে চাও 'আনন্দমেলা'র ক্যাম্পাসের পাতায়? তা হলে ৪০০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠাও আমাদের দপ্তরে, সঙ্গে ভাল রঙিন ফোটো পাঠিও কিন্তু! লেখাটি স্কুলের প্রধানকে দিয়ে প্রত্যয়িত করে নিতে ভুলো না। আমাদের ঠিকানা:

আনন্দমেলা

ক্যাম্পাস বিভাগ

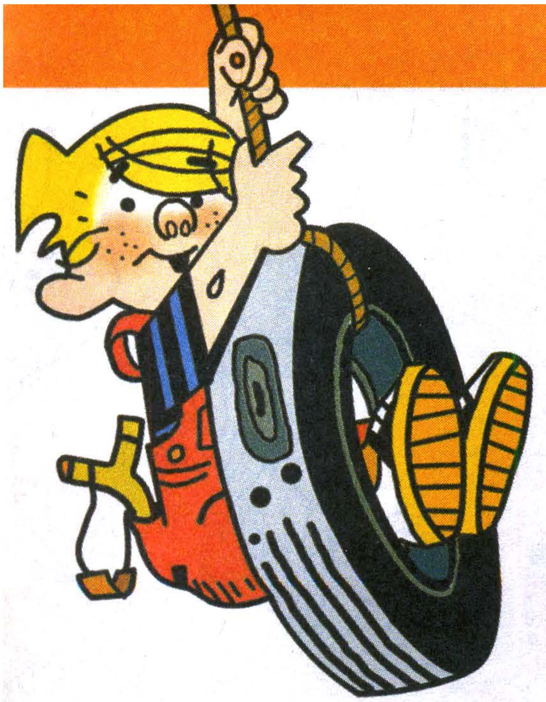
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১



‘ডেনিস দ্য মেনাস’ বিক্রি হয়েছে পাঁচ কোটিরও বেশি

১৯৫০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ‘ডেনিস দ্য মেনাস’ কমিক। তারপর থেকে ৪৮টি দেশের এক হাজারেরও বেশি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে এই কমিক। লিখেছেন

অভিজিৎ সুকুল



পুরো নাম: ডেনিস মিচেল।

স্রষ্টা: হেনরি হাঙ্ক কেচাম। তাঁকে সাহায্য করতেন মার্কাস হ্যামিল্টন এবং রোনাল্ড ফার্দিনান্দ। ২০০১ সালে একাশি বছর বয়সে মারা যান কেচাম। শেষ দিন পর্যন্ত ‘ডেনিস দ্য মেনাস’ কমিকে সক্রিয় ভূমিকা ছিল তাঁরই।

প্রথম প্রকাশ: ১৯৫০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ‘ডেনিস দ্য মেনাস’ কমিক। তারপর থেকে ৪৮টি দেশের এক হাজারেরও বেশি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে এই কমিক। অনূদিত হয়েছে ১৯টিরও বেশি ভাষায়। বিক্রি হয়েছে পাঁচ কোটিরও বেশি বই।

ডেনিসের মজাদার দুনিয়া: কখনও পাঁচ না পার হওয়া ডেনিস এক ছটফটে, দুরন্ত ছেলে। তার মাথায় এসে জড়ো হয় অদ্ভুত সব আইডিয়া, আর সেই সব আইডিয়া সত্যি করতে গিয়ে ডেনিস ঘটিয়ে ফেলে মজাদার নানা কাণ্ড। অবশ্য সব সময় যে তার আইডিয়াগুলো মজাদার কাণ্ডই ঘটায় তা নয়, অন্যদের বিপদে ফেলতেও (যদিও মোটেই ইচ্ছাকৃতভাবে নয়) তার জুড়ি মেলা ভার। তার মাথায় সব সময় গিজগিজ করে অসংখ্য প্রশ্ন, যার উত্তর দিতে গিয়ে জেরবার হন বড়রা। দুষ্টুমি করার পর তাকে ধরতে পারাটাও আর এক ঝক্কির ব্যাপার।

অন্যান্য চরিত্র: ডেনিসের বাবার নাম হেনরি মিচেল। তিনি পেশায় এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ডেনিসের মা অ্যালিস। দিনের বেশিরভাগ সময়টাই তাঁর কাটে বাথটবে, ডেনিসের গায়ের ধুলো ময়লা পরিষ্কার করতে। তাদের পরিবারে আছে পোষা কুকুর ‘রাফ’ আর বিড়াল ‘হটডগ’। ডেনিস কমিকের আর-এক মজাদার চরিত্র মিস্টার জর্জ উইলসন। ডাকবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এই কর্মী এবং তাঁর স্ত্রী মার্থা ডেনিসদের প্রতিবেশী। নিঃসন্তান এই দম্পতি ডেনিসকে খুবই ভালবাসেন, যদিও ডেনিসের দস্যিপনা মাঝে-মাঝেই বিপদে ফেলে তাঁদের। জোয়ে ম্যাকডোনাল্ড নামের আর-এক পুঁচকে ছেলে ডেনিসের বন্ধু। ডেনিসের সঙ্গে সব সময় ছায়ার মতো লেগে থাকে সে। আর আছে জিনা জিলত্তি নামের একরত্তি মেয়ে। জিনা টিকটিকি বা মাকড়সা দেখে যে কেন ভয় পায় না, এটা ডেনিসের কাছে এক মস্ত বিস্ময়। সে প্রায়ই জিনাকে জিজ্ঞেস করে, “সত্যি করে বলো তো, তুমি কি মেয়ে?” দাদু জনসন বছরে দু’বার বেড়াতে আসেন ডেনিসদের বাড়িতে। সে সময়টা দাদুর প্রশ্রয়ে বেশ ভালই কাটে ডেনিসের।

ডেনিস-সৃষ্টির পিছনে: হাঙ্ক কেচামের আত্মজীবনী ‘দ্য মার্চেন্ট অব ডেনিস’ থেকে জানা যায় ডেনিস চরিত্র সৃষ্টির গল্প। একদিন হাঙ্ক যখন তাঁর স্টুডিওয় বসে কাজ করছেন, তখন তাঁর স্ত্রী ছেলের দস্যিপনায় বিব্রত হয়ে বলেছিলেন, “আর পারি না বাপু তোমার ছেলেকে নিয়ে। ইওর সন ডেনিস ইজ আ মেনাস।” তখনই ডেনিসকে নিয়ে কমিক-এর পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে। টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে ধার করেছিলেন ‘মিচেল’ পদবিটি।

বড় ও ছোট পরদায় ডেনিস: ডেনিসকে নিয়ে তৈরি হয়েছে জনপ্রিয় টেলিভিশন সিরিজও। ডেনিসের ভূমিকায় অভিনয় করেন জে নর্থ। এ ছাড়াও তৈরি হয়েছে অ্যানিমেশন ছবি। ১৯৯৩ সালে বড় পরদায় দেখা যায় ডেনিসকে। ওই ছবিতে ম্যাসন গ্যাম্বল ডেনিসের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, আর ওয়াল্টার ম্যাথু ছিলেন মি. উইলসনের ভূমিকায়।

আরও ডেনিস: বয় স্কাউট্‌স অফ আমেরিকা, ইউনিসেফ এবং ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রস সোসাইটির মুখপাত্রের ভূমিকায়ও দেখা গেছে ডেনিসকে। ক্যালিফোর্নিয়ার মনতেরেতে আছে ‘ডেনিস দ্য মেনাস প্লেগ্রাউন্ড’। এর আদলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি হয়েছে আরও কিছু ডেনিস পার্ক। মিস্টার উইলসন নামে হাঙ্ক কেচামের একজন শিক্ষক ছিলেন। ডেনিসের বান্ধবী জিনার নামটা নেওয়া হয়েছিল ইতালির অভিনেত্রী জিনা লোলোব্রিজিদার নাম থেকে। কানসাসের উইচিতা শহরে থাকে ডেনিসরা। হাঙ্ক কেচামকে ওই শহরের ‘সাম্মানিক মেয়র’-এর পদ দেওয়া হয়েছিল।



ছবি: সঞ্জীবন বসু

হিদাসপাসের যুদ্ধ

দেবাশিস মজুমদার



টানা লাল বারান্দার এক প্রান্তে অথর্ব এক টেবিল। জরাজীর্ণ, বনেদি এবং বাতিল। একটা পায়া ভাঙা। সেই জায়গায় কয়েকটি ইটের থাক দিয়ে টেবিলটাকে ধরে রাখা হয়েছে। একটু জোরে হাওয়া দিলেই টেবিলটা ককিয়ে ওঠে। ওর সর্বাঙ্গ দিয়ে মৃত্যুর করুণ গান বেরিয়ে আসে। কারও কোনও কাজেই এখন লাগে না টেবিলটা। শুধু রোজ সকালে ভদুবাবু এই টেবিলটায় দাড়ি কামাতে বসেন। ভদুবাবু অর্থাৎ ভদ্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় খুব হাঁকডাকের মানুষ। রাগী এবং কলহপ্রিয় হিসেবে পাঁচ-সাতখানা গ্রামের মানুষ ভদুবাবুকে চেনে। সমীহের গলায় বলে, "দাপের মানুষ বটে ভদুবাবু। এমন লাগাম ছাড়া রাগের আধার বড় একটা দেখা যায় না। আগেকার রাজারাজড়াদের এই রকম রাগ আর চিৎকার, চেঁচামেচির ক্ষমতা ছিল। আজকাল তো এ জিনিস মেলেই না। কাকচিলও বাড়িতে বসতে গেলে ভদুবাবুর পারমিশন চায়। হেঃ বাবা!"

রেগে যাওয়াটা ভদুবাবুর প্রিয় শখ। খুব বেশি দিন একটানা না রেগে থাকলে ভারী মুশকিলে পড়ে যান তিনি। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুমের মধ্যেই কেঁদে ওঠেন। বদহজম হয়। চোঁয়া-চোঁয়া ঢেকুর ওঠে। তখন সারাদিন বেজায় মনমরা হয়ে থাকেন। আর হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ান কোনও জুতসই উপলক্ষ, যা থেকে তাঁর শরীরে ভীষণ রাগ তৈরি হতে পারে। হয়তো বাজারে গিয়ে মাছওলাকে খেপিয়ে দিতে পাঁচজনকে শুনিয়ে বললেন, "নন্দ, তোমার আক্কেলখানা কী! মর্গ থেকে এই দোরসা মাছ নিয়ে এসে আশি টাকা কেজি নিচ্ছ! তার চেয়ে তোমার ওই আঁশবঁটিটা মানুষের গলায় বসিয়ে দাও না হে!"

এ কথায় নন্দর জ্বলে ওঠার কথা। তেরিয়া গলায় দু' কথা শুনিয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক। ভদুবাবু সেই আশায় থাকেন। কিন্তু তাঁর সেই আশা পূরণ হয় না। নন্দ খুব মিহি এবং সেয়ানা গলায় বলল, "যথার্থই বলেছেন ভদুবাবু। নিকষ্যি কলিকাল বলেই পার পেয়ে যাচ্ছি। এই



কিছুক্ষণ আগে হরুমাস্টারকে পোয়াটাক মাছ বেচে সেই কথাই বলছিলাম। আপনারা মাছ চেনেন না। হতেন ভদুবাবু। আধমাইল দূর থেকে গন্ধ শুঁকে বুঝে নিতেন মাছটা দোরসা। আর নাকে কাপড় দিয়ে আচ্ছাসে জুতোপেটা করতেন আমাকে। আহা, এমন সমঝদার খদ্দের না হলে মাছ বেচে সুখ আছে মশাই!"

ভদুবাবু রাগতে পারলেন না। মনটা হতাশায় ভরে উঠল। বাজার করতে গিয়ে সব উলটোপালটা করে ফেললেন। ফেরার পথে যুধিষ্ঠিরকে দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। যুধিষ্ঠির গঞ্জের নাম করা চোর। টানা এক মাস কখনও জেলের বাইরে থাকে না। যুধিষ্ঠিরকে পেয়ে খুশিয়াল ভদুবাবু ভাবলেন, চোর কে চোর বললে আর রক্ষে নেই। ঝগড়া না করে যুধিষ্ঠির যাবে কোথায়! তুলকালাম এক ঝগড়ার আশায় ভদুবাবু খুব উঁচু গলায় বললেন, "জেলঘুঘু যে! জেলের বাইরে যে বড়! মহাবিদ্যায় খুব সুবিধে হচ্ছে না বুঝি! নাকি ভি আর এস নিলে হে?"

রাগ তো দূরের কথা, যুধিষ্ঠির খুব বৈষ্ণবের গলায় বলল, "প্রাতঃপ্রণাম ভদুবাবু। আপনার খোঁজেই তো যাচ্ছিলাম। দেখুন দেখি, করুণাময়ের কী লীলা! আপনাকেই পাঠিয়ে দিলেন আমার কাছে। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন চুরির কথা? মিথ্যে বলব না মশাই, বাজার এখন খুব তেজি। আপনার বাপপিতেমোর আশীর্বাদে আয়পয় মন্দ হচ্ছে না। এই তো কাল রাতেই ঢেঁকিবাবুর বাড়িতে ঢুকে ওঁর বড়খোকার কম্পিউটার থেকে হার্ড ডিস্ক আর প্রিন্টারটা সরিয়ে নিলাম। এত কাজ চার দিকে, একা সামলে উঠতে পারছি না। ভাবছি কিছু আউটসোর্সিং করে দেব।"

যুধিষ্ঠিরের কথায় থতমত খেয়ে ভদুবাবু বললেন, "তা হলে মুখ চুন করে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?"

ভাঙা গলায় যুধিষ্ঠির বলল, "সে আর বলবেন না। আজকাল জুতসই মার জুটছে না কপালে। কথায় বলে, চোরের ঠ্যাঙানি। যে যত ঠ্যাঙানি হজম করতে পারবে সে তত বড় কুলীন চোর। আমার গুরু, ছোট জাগুলিয়ার ফটিকচাঁদ ওস্তাদ। প্রাতঃস্মরণীয় লোক মশাই। মার খাওয়ায় পিএইচ ডি। আহা, কী মারটাই না হজম করতে পারতেন! লোকের হাতে ধরা পড়ে জনতা ধোলাই, পুলিশের হাতে বুকে বাঁশডলা, এসব ছিল গুরুজির উপাদেয় পথ্য। মার খেয়ে ঢোল হয়ে উঠে দাঁড়াতেন হাসিহাসি মুখে। যেন জন্মদিনের পায়েস খেয়ে উঠলেন! আর আমি, মার না খেয়ে-খেয়ে নিজেকে চোর বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা করে। কেউ পাত্তাই দিতে চায় না। এই আপনার মতো সহৃদয়, সজ্জন দু'-একজন তবু চোর বলে স্নেহ করেন এখনও। গতবার ধরা পড়ে থানার দারোগাবাবুর হাতে-পায়ে ধরলাম, 'দয়া করুন স্যার। মোক্ষম মার না দিয়ে আমাকে ছাড়বেন না। দু' বেলা আচ্ছা করে পেটান। ধোপার পাটে আছড়ান। কথা দিন!' তা মশাই দারোগাবাবু কথা দিয়ে কথা রাখলেন না। কচুয়া ধোলাই বলে যেটা চালালেন, সেটা নিতান্তই জাদুর গায়ে হাত বোলানো। যেন চিতু ক্ষৌরকারের ফুলবডি ম্যাসাজ। তখনই ঠিক করেছিলাম জেল থেকে বেরিয়েই ভদুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওই একজন মানুষই তো আছেন, যাঁর মধ্যে সাচ্চা রাগ আছে। আপনি কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না ভদুবাবু। আমি ছুটির দিন নিয়ম করে আপনার বাড়ি যাব। আর আপনি মনের সুখে আমাকে পেটাবেন। এমন মার মারবেন মশাই, যেন মাজা ভেঙে যায়। নাক-মুখ দিয়ে গলগলিয়ে রক্তপাত হয়। দিন পনেরো অন্তত শয্যাশায়ী থাকতে পারি। আপনাকে কথা দিতেই হবে ভদুবাবু। আমি জানি, আপনার মতো সজ্জন মানুষ আমাকে

ফেরাবেন না।"

দিনে-দিনে হতাশা বাড়ছিল ভদুবাবুর। কেউ তাঁকে রাগতে সাহায্য করছে না। শত্রু-মিত্র, বেয়াই-বোনাই, সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ভদুবাবুকে রাগানো চলবে না। নিজের মনে দীর্ঘশ্বাস মোচন করেন ভদুবাবু। চোখের সামনে দিয়ে অযথা সময় বয়ে যাচ্ছে। আজকাল সারাদিনের মধ্যে কতটুকু সময়ই বা রাগতে পারেন তিনি। ছেলে যজ্ঞদাসকে পড়ানোর সময়টুকু ছাড়া আর তো রাগার উপায়ই নেই। রাগ ছাড়া বেঁচে থেকে লাভ কী?

ক্রোধহীনতার আশঙ্কায় ভদুবাবু গভীর অবসাদে ডুবে যাচ্ছিলেন। ঠিক এই সময়ে তিনি চমৎকার একটা রাগের উৎস আবিষ্কার করলেন। সকালবেলায় তিনি দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম বিছিয়ে বসলেই কোথা থেকে দু'টো কাক উড়ে এসে বারান্দার রেলিংয়ে বসে। তারপর শুরু হয় এয়ার অ্যাটাক। ছোঁ মেরে এসে জলের বাটি ধরে টানে। জল পড়ে চার দিকে ছয়ছত্রখান। ভদুবাবুর দিক থেকে বুলেট ছুটে যায়, "বদমাশ!"

পাখার ঝাপটায় কাত করে ফেলে আয়না। রিফ্লেক্স অ্যাকশনে দ্রুত মাথা সরাতে গিয়ে গাল কেটে ফেলেন ভদুবাবু। সাদা ফেনামাখা গাল ফুঁড়ে সূর্যোদয়। তেড়ে উঠে জবাবি ফায়ার করেন ভদুবাবু, "কনডেনসড্ ত্যাঁদড়।"

অনেকক্ষণ ধরে খেলাটা জমে যায়। খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ভদুবাবু। বাড়ি বয়ে এসে রোজ রাগিয়ে যাওয়া! এ যে মেঘ না চাইতেই জল! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! যেন নবজীবন লাভ করলেন ভদুবাবু। এঁটেল মাটির গুলি বানিয়ে, রোদে শুকিয়ে, উনুনের মরা আঁচে পুড়িয়ে বুলেট বানিয়ে নিলেন। এখন দাড়ি কামাতে বসলে পাশে থাকে বুলেটের ঝুড়ি। কাকগুলো রেলিংয়ে বসলেই আয়নায় ছায়া পড়ে। সেই ছায়া দেখে কাক দু'টোর দিকে পিছন ফিরেই গুলি ছোড়েন ভদুবাবু। আজ সকালেও খেলাটা চলছিল। বাড়ির কাজের মেয়ে আহ্লাদী বারান্দা মুছতে-মুছতে রানিং কমেন্ট্রি করে যাচ্ছিল, "একটু বাঁ দিক ঘেঁষে ছুড়ুন বাবু। তা হলেই শয়তান দু'টোর মুড়োয় লাগবে। থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে। এ হে! পেরায় লেগেছিল। একটুর জন্যে ফসকালেন। বল্লালবাবু বাজারে যাচ্ছিলেন, ওঁর মাথায় পড়েছে। আহা গো, বল্লালবাবুর তেলা মাথায় আর-একটা গুলি গজাল।

"এটা বড্ড আনাড়ি হয়ে গেল বাবু। কালু উকিলের টিনের চালে গিয়ে পড়ল। খুব চেঁচাচ্ছে। মামলা করবে বলে ভয় দেখাচ্ছে।"

ভদুবাবু নির্বিকার। এক হাতে গালে ক্ষুর চালাচ্ছেন। আর আয়নায় ছবি দেখে উলটো দিকে গুলি ছুড়ছেন। গুলি এর বাড়ি ওর বাড়ি গিয়ে পড়ছে। উত্তপ্ত কথা ছিটকে-ছিটকে আসছে, "ভীমরতি, ভীমরতি! বুড়ো বয়সে বসে-বসে গুলি ছোড়া। অনাসৃষ্টি!"

ভদুবাবুর এমনিতেই মাথা গরমের ধাত। বোধ হয় ইদানীং খুব বেড়ে গিয়েছে। এখন না হয় গুলি ছুড়ছেন। এর পর যদি থান ইট ছুড়তে শুরু করেন!

এই যুদ্ধের আবহাওয়ার মধ্যেই বই-খাতা নিয়ে ভয়ে-ভয়ে এসে দাঁড়ায় যজ্ঞদাস। ভদুবাবু আড়চোখে ছেলেকে দেখেন। সাময়িক যুদ্ধ বিরতি। ভদুবাবু ছেলেকে টাস্ক দেন, "টেক ডাউন, টেক ডাউন। পিতাপুত্রের বর্তমান বয়সের সমষ্টি আটচল্লিশ বছর। দশ বছর পূর্বে...।"

যজ্ঞদাস নত মুখে অঙ্কটা লিখে নিল। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। ভদুবাবুর দাড়ি কামানো আর গুলি ছোড়া অব্যাহত। কাক দু'টো ক্যা-ক্যা করে ডেকেই যাচ্ছে। খাতা থেকে মুখ তুলে যজ্ঞদাস ভয়ে-ভয়ে বলল, "হয়ে গিয়েছে বাবা।"

"মিলিয়ে নিয়েছ?"

"হুঁ।"

"কত হল?"

"পিতার বয়স সাত। পুত্রের তেত্তিরিশ।"

"লাঠিটা কোথায়, লাঠিটা কোথায়?" চেঁচাতে-চেঁচাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন ভদুবাবু। কাক দু'টো ভয় পেয়ে উড়ে পালিয়ে গেল। কোমরের কষি আঁটতে-আঁটতে ছেলের দিকে এগিয়ে গেলেন ভদুবাবু। তারপর বারান্দা জুড়ে পিতাপুত্রের ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল।

॥ ২ ॥

ভদুবাবুর স্ত্রী ময়নাদেবী খুবই শান্ত এবং নিরীহ। সারাদিন সংসারের কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। তাঁর নিজের খুব একটা দাবি নেই, চাহিদা নেই। ময়নাদেবীও কিন্তু বেঁকে বসলেন এইবার। যজ্ঞদাসের একজন গৃহশিক্ষক চাই।

ভদুবাবু স্ত্রীকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন, "গৃহশিক্ষক কী আর আমার মতো পড়াবেন? যজ্ঞির দোষত্রুটিগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কী শোধরানোর চেষ্টা করবেন? ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে!"

কোনও যুক্তিই ময়নাদেবীর কানে উঠল না। বারবার শান্ত গলায় তিনি একই দাবি পেশ করে গেলেন, "ওই যে নতুন মাস্টার গাঁয়ে এসেছেন! ভিকিস্যার। কত ছেলে ওঁর কাছে পড়ে। আমার যজ্ঞিকেও উনি ঠিক পাশ করিয়ে দেবেন।"

এই ঘটনায় ভদুবাবু দু'-একদিন রেগে যেতে পারলেন বটে, কিন্তু ময়নাদেবীকে ঠেকাতে পারলেন না। ময়নাদেবী একই রকম শান্ত এবং দৃঢ়। ভদুবাবুও স্ত্রীকে খুব একটা ঘাঁটানোর সাহস পেলেন না। ময়নাদেবী এমনিতে খুবই নিরীহ, কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি রকমের অশান্তি হলে তিনি নিঃশব্দে রান্না বন্ধ করে দেন বেশ কয়েক দিনের জন্য। সারাদিন সুর করে কাঁদেন। আর তাঁর দুঃখের কাহিনি নিয়ে নকশি-কাঁথা সেলাই করেন। বাড়িতে খানদশেক নকশি-কাঁথা জমে গিয়েছে। সেলাই করতে-করতে চোখ টনটন করলে গয়নাবড়ি দেন। পাছে খ্যাঁট বন্ধ হয়ে যায়, সেই আশঙ্কায় ভদুবাবু ভিকিস্যারের কোচিং ক্লাসে ছেলেকে নিয়ে হাজির হলেন। ডোরবেল টিপতেই এক সা-জোয়ান যুবক বেরিয়ে এলেন। দেখে চমকে উঠলেন ভদুবাবু। এ কে গো! প্রাইভেট টিউটর না ছোটা বিপিন। ব্যায়ামবীরের চেহারা। সারা দেহে মাস্‌ল ফুলে-ফুলে উঠছে। যেন 'প্লেচু অফ ছোটনাগপুর'। পরনে বারমুডা আর টি-শার্ট। গলায় মোবাইল। কিছুক্ষণ ভদুবাবু আর যজ্ঞদাসকে ভাল করে দেখলেন তিনি। তারপর খুব মোহন হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন, কী কেস?"

ভদুবাবু থতমত খেয়ে বলে উঠলেন, "এই আমার ছেলের টিউশনির জন্য...।"

"কোন ক্লাস?"

"নাইন।"

"সি বি এস ই না আই সি এস ই, না মাধ্যমিক, নাকি মাদ্রাসা?"

"ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড।"



গ ল্প

"একটাই মাত্র ভেকেন্সি আছে। আপনি খুব লাকি। যাকগে, প্রবলেমটা কী হচ্ছে?"

একটু গলাখাঁকারি দিয়ে ভদুবাবু বললেন, "ইয়ে মানে, যজ্ঞি এমনিতে বেশ শার্প। বাড়িতে তো সবই ঠিকঠাক লেখে। পরীক্ষার হলে কী যে হয়! সব গন্ডগোল করে ফ্যালে।"

"ল্যাক অফ কনফিডেন্স। ভাববেন না, ঠিক হয়ে যাবে। ট্রানস্লেট করো তো ভাই! '১৯৪২ সালে গাঁধীজি জেলে ছিলেন'।"

যজ্ঞদাস নিশ্বাস বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর মরিয়া গলায় বলে উঠল, "ইন দ্য ইয়ার অফ নাইনটিন ফরটি টু, গাঁধীজি ওয়াজ এ ফিশারম্যান।"

ভদুবাবুর মুখ থেকে বুলেটের মতো ছিটকে বেরিয়ে এল, "লাঠিপেটা করুন। লাঠিপেটা করুন।"

ভদুবাবুকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে ভিকিস্যার বললেন, "ওয়ান্ডারফুল। হাই আই কিউ। ইমাজিনেটিভ। উপস্থিত বুদ্ধি আছে। ঘাবড়াবেন না। প্রথমেই একটা সাইকো অ্যানালিসেসর প্যাকেজ কোর্স করিয়ে দেব। ম্যাজিকের মতো ফল পাবেন।"

ভদুবাবু বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "না না, ওকে আপনি পাগল ভাববেন না।"

ভিকিস্যার খুব চওড়া হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে বললেন, "যুগটা এখন অনেক পালটে গিয়েছে। এখন প্রাইভেট টিউশনিটাও একটা ইনোভেটিভ অ্যান্ড ইভলভিং প্রসেস। বায়োলজিক্যাল গ্রোথের মতো। আপনি চিন্তা করবেন না। দু'-একটা কাউন্সেলিং-এর পরেই পার্থক্যটা টের পাবেন।"

যুবকের কথায় কী একটা জাদু আছে। ভদুবাবু মোহিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার ফিজ় কত ভিকিবাবু?"

"উইথ এসি অ্যান্ড কোল্ডড্রিঙ্ক, অর অর্ডিনারি?"

ভদুবাবুর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। বলেন কী! এ কোচিং ক্লাস না পুরীর হোটেল! খুব দ্বিধা এবং আশঙ্কার গলায় ভদুবাবু বললেন, "ইয়ে, মানে ব্যাপারটা কী যদি একটু বুঝিয়ে বলেন।"

ভিকিস্যার খুব ব্যবসায়িক গলায় বললেন, "দেখুন, প্রাইভেট টিউশনিটা একটা সার্ভিস। ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস। আমার কোচিংয়ে দু'রকম সার্ভিস প্যাকেজ আছে। যদি ছাত্রকে এসি রুমে পড়াই, আর একটা করে কোল্ডড্রিঙ্ক অফার করি, তা হলে একরকম রেট। আর নো এসি, নো কোল্ডড্রিঙ্ক, আই মিন অর্ডিনারি রেটটা একটু কম।"

ভদুবাবু একটু ঢোক গিলে বললেন, "ইয়ে, বলছিলুম কী ভিকিবাবু, আপনি যদি আমার বাড়ি গিয়ে পড়ান!"

মনে-মনে কী একটা দুর্বোধ হিসেব কষে ভিকিস্যার বললেন, "এই স্কিমটা এখনও চালু হয়নি। ঠিক আছে। সাড়ে সাতশো করে দেবেন মাসে। যদি এক বছরের ফিজ় একসঙ্গে ডাউন পেমেন্ট করেন, তা হলে একটা ডিস্কাউন্ট পাবেন। আর বছরের শেষে একটা গিফ্ট হ্যাম্পার।"

ভদুবাবু আর দরকষাকষিতে না গিয়ে, "হুঁ" দিলেন।

শুরু হয়ে গেল যজ্ঞদাসের প্রাইভেট টিউশনি। ভিকিস্যার নিয়ম করে সন্ধেবেলায় আসেন। সাইলেন্সার ফাটা বাইকে চড়ে। বাইকের আর্তনাদ শুনে পাড়াপড়শি ঘড়ি মিলিয়ে নেয়, "ওয়, ভিকিস্যার এলেন। সাড়ে ছ'টা বাজল গো।"

সত্যি বলতে কী, ভিকিস্যারের কাছে পড়ে যজ্ঞদাসের বেশ উন্নতিই হচ্ছে। কনফিডেন্স বাড়ছে। ভুলের সংখ্যা অনেক কম। একদিন ক্লাসের ফার্স্ট বয় কুসুমকোমলেরও আগে দু'-দু'টো উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে ফেলল। ইংরেজিস্যার পতিতপাবন চোংদার অবধি সুখ্যাতি করে একদিন বলেই ফেললেন, "তুমি কি কোনও টনিকফনিক খাচ্ছ যজ্ঞদাস? বুদ্ধিটা যেন খুলছে বলে মনে হচ্ছে।"

ভিকিস্যার যজ্ঞদাসকে বুঝিয়েছেন, "আসল জিনিস হল কারেজ, কনফিডেন্স। প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলেও কুছ পরোয়া নেই। লড়ে যাবে। উপস্থিত বুদ্ধি খাটাবে। এই মন্ত্রেই যজ্ঞদাস ক্রমশ উন্নতি করে চলেছে।"

বসন্ত এসেছে আবার। চৌধুরীদের ধানখেতে কুহেলিকাময় অপার এক সবুজ চাদর বিছিয়েছে কেউ। কোনও গোপন অদৃশ্যে অবিরাম ফাগুয়ার গান গেয়ে চলেছে এক উদাসী বাউল। হাওড় বাতাসে মিশে আছে আমের বকুলের অলৌকিক ঘ্রাণ। প্রতিদিন সকালে জাম আর জারুল গাছের কোলে গান গেয়ে ওঠে একদল বৈতালিক কোকিল। হালদার পুকুরে প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামীণ জ্যোৎস্না গুলে যায়। দোলা খায় পরিপূর্ণ মেঠো চাঁদের নম্র জলছবি।

যজ্ঞদাসের বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। বেশ ভাল হচ্ছে পরীক্ষাগুলো। অন্তত ভিকিস্যার মনে করছেন, রেজাল্ট অনেক ভাল হবে। আজ ইতিহাস পরীক্ষা। বেশ খুশি মনেই পরীক্ষা হলে ঢুকেছিল যজ্ঞদাস। পকেটে মা বিশালক্ষ্মীর প্রসাদি ফুল খড়মড় করে ভরসা জোগাচ্ছে। হাতে বল্লমের মতো মন্ত্রপূত কলম। কপালে দইয়ের ফোঁটা। প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে কেঁপে উঠল যজ্ঞদাস। বেশিরভাগ প্রশ্নই অজানা। অগণন ভয়ের চাবুক খেল। সর্বাঙ্গে বিঁধে গেল অসংখ্য হতাশার তির।পরক্ষণেই মনের মধ্যে ঘাই দিয়ে উঠল ভিকিস্যারের অভয় কণ্ঠ। যজ্ঞদাস বারবার পড়ল প্রশ্নপত্র। যতবার পড়ছে, ততই জট খুলে যাচ্ছে। মনে পড়ে যাচ্ছে কয়েকটা উত্তর। সেগুলো লিখে ফেলল দ্রুত। পাশ মার্কের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে বোধ হয়। বাকি শুধু 'টিকা লেখো'। হিদাসপাসের যুদ্ধ। ওটায় আট নম্বর আছে। আবছা স্মৃতি হাতড়ে যজ্ঞদাস লিখল, "৩২৬ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে হিদাসপাস নদীর ধারে গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের সঙ্গে ভারতীয় সম্রাট পুরুর যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাহাই ইতিহাসবিখ্যাত হিদাসপাসের যুদ্ধ।" আর কিচ্ছু মনে পড়ছে না। এতে কি দুইয়ের বেশি জুটবে? মনে তো হয় না। সাত-পাঁচ ভেবে যজ্ঞদাস মরিয়া হয়ে লিখে দিল, "যুদ্ধের দু'দিন আগে আলেকজান্ডার পুরুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। পুরু তখন বাড়িতে ছিলেন না। আলেকজান্ডার পুরুর মাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মাসিমা, পুরু বাড়িতে আছে?'

"পুরুর মা বললেন, 'না তো বাবা। খোকা তো একটু বেরিয়েছে। তুমি কে বাবা? কাদের বাড়ির ছেলে?'

"উত্তরে আলেকজান্ডার বললেন, 'মাসিমা, আমাকে আপনি চিনবেন না। আমার নাম আলেকজান্ডার। পুরু বাড়ি ফিরলে ওকে বলে দেবেন, দু' দিন পরে নদীর ধারে যুদ্ধ আছে। ও যেন যায়।' "

ছবি: অনুপ রায়



গৌরী সেনের চশমা

জয়দীপ চক্রবর্তী

যে অফিসে চাকরি করেন কৃপাসিন্ধু দত্ত, সে অফিসটা মোটের উপর মন্দ নয়। মাইনেপত্তর ভালই। কপাসিন্ধুর সংসারে অভাব থাকার কথা নয়। অভাব তাঁর নেইও। বরং অন্য আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের চেয়ে জমা টাকাপয়সা একটু বেশিই। আসলে কৃপাসিন্ধু খুব একটা খরুচে মানুষ নন। প্রয়োজনের বাইরে পয়সা খরচ করার বদ অভ্যেস তাঁর নেই, আর এ বিষয়ে তাঁর সচেতনতাও আকাশছোঁয়া।

তিনি বাজার থেকে সবচেয়ে কম দামের সব্জি কেনেন। সপ্তাহে এক দিন মাছ। তাও সকলে কিনে চলে যাওয়ার পর যে মাছগুলো নরম হয়ে নেতিয়ে পড়ে, মাছি ভনভন করে যাদের উপর, দোকানদারও যখন উঠি-উঠি করতে শুরু করে, কৃপাসিন্ধু সেই মাছগুলো কিনে নেন অল্প দাম দিয়ে। জামা-কাপড়ের বিলাসিতা তাঁর কোনও কালে ছিল না। এখনও জামা-কাপড় বলতে তাঁর একজোড়া প্যান্ট, খান তিনেক শার্ট আর গোটা দুই লুঙ্গি। মাঝে জুতো নিয়েও কোনও সমস্যা বোধ করেননি তিনি। হাওয়াই চটিতেই সন্তুষ্ট ছিলেন চিরকাল। ইদানীং পায়ের নীচে খান তিনেক জবরদস্ত গুঁপো গজানোয় একটু নরম জুতো ছাড়া পায়ে রাখতে পারেন না। তাতে খরচ বেড়ে যাওয়ায় একেবারে মরমে মরে আছেন তিনি।

গানবাজনা জিনিসটা কৃপাসিন্ধু যে একেবারে সহ্য করতে পারেন না তা নয়। বরং জিনিসটা তাঁর মনের মধ্যে বেশ একটা আনন্দ-আনন্দ অনুভূতিই তৈরি করে। মাঝেমধ্যে ক্যাসেট-সিডির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দু'-এক দণ্ড গান শোনেন না যে তিনি, এমনটাও নয়। কিছু-কিছু গান শুনে আপনাআপনি তাঁর মাথা দুলে ওঠে, তারিফ করে ওঠেন তিনি উচ্ছ্বসিত গলায়। কিন্তু নিজে অর্থ ব্যয়ে গানের কল কিনে বাড়িতে বসে-শুয়ে গান





শুনবেন, এমন ভয়ংকর এবং সর্বনেশে চিন্তা একবারের জন্যও কখনও মনে আসেনি তাঁর। কখনও-কখনও গভীর রাতে যদি চোখে ঘুম না আসতে চায়, অথবা সাংসারিক প্রয়োজনে যেদিন নিতান্ত অনিচ্ছেতেও টাকাপয়সা খরচখরচা একটু বেশি হয়ে যায়, সেদিন মনটাকে চাঙা করার জন্য তাঁর একটু গান শোনা, গান শোনা ভাব জাগে।

এসময়ে নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন তিনি। তারপর বালিশের নীচ থেকে একটা গোল রিং-এ বাঁধা ছোট্ট চাবি বের করে নিয়ে এগিয়ে যান একটা মাঝারি মাপের টিনের তোরঙ্গের দিকে। তোরঙ্গটিকে এক টাকা, দু' টাকা, পাঁচ টাকার কয়েন দিয়ে ভর্তি করছেন তিনি গত বছর কয়েক ধরে। এমন তোরঙ্গ তাঁর আরও খানদুই ছিল। তবে সেগুলোর আয়তন তুলনায় অনেক কম। ঈশ্বরের কৃপায় এবং নিজের সারা জীবনের সাধনা ও কৃচ্ছ্রসাধনে কৃপাসিন্ধু সে দু'টোকে পূর্ণ করে আপাতত তালা বন্ধ করে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন খাটের নীচের দেওয়াল ঘেঁষা গুপ্ত কুলুঙ্গিতে। ভর্তি না হওয়া তোরঙ্গটি দু' হাতে তুলে ধরে তিনি আলতো করে ঝাঁকুনি দেন, আর ঝনাৎ ঝন, ঠনাত ঠন আওয়াজ ওঠে তার মধ্যে থেকে। সেই অদ্ভুত, অপার্থিব এবং চিত্তমুগ্ধকারী আওয়াজে কৃপাসিন্ধুর মনের সব মালিন্য মুছে যায়। চাবি ঘুরিয়ে তোরঙ্গের ডালা খুলে আঙুল দিয়ে পয়সার মাঝখানে বিলি কাটতে-কাটতে দোকানের বক্সে শোনা গানগুলো সব এলেবেলে মনে হয় তাঁর। পয়সার মৃদু রিনরিন, ঠিনঠিন আওয়াজের মধ্যে বুঁদ হয়ে বসে থাকতে-থাকতে এক সময় শান্তিতে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। কৃপাসিন্ধু তোরঙ্গের ডালা বন্ধ করে, তালা লাগিয়ে তখন আবার নিশ্চিন্তে ফিরে আসেন নিজের বিছানায়।

কৃপাসিন্ধু জানেন, এলাকার লোক তাঁকে নিয়ে রঙ্গ-তামাশা করে। তিনি এও জানেন যে, মানুষ আড়ালে আবডালে ইতিমধ্যেই 'কঞ্জুষ শ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করেছে তাঁকে। এমনকী, পাড়ার ছোটরাও রাস্তাঘাটে তাঁকে দেখে মুখ টিপে হাসে অথবা হাততালি দিয়ে ওঠে কোনও অদ্ভুত বস্তু দেখার মতো মুখ করে। অথচ কৃপাসিন্ধুর এতে এতটুকু রাগ, দুঃখ বা অভিমান হয় না। বরং নিজের উপর আস্থা তাঁর দ্বিগুণ হয়ে যায়।

ছেলেবেলায় তাঁর বাবা বলতেন, "যে-কোনও ভাল কাজ করতে গেলেই অনেক মানুষ বাধা দেবে, উপহাস করবে, গালমন্দ করবে তোমার নামে, কিন্তু সব কিছু উপেক্ষা করে নিজের সংকল্পে অটল থাকার নামই সাধনা। আর এই সংকল্প, এই সাধনা না থাকলে জীবনে কখনও কিছু পাওয়া যায় না।"

কৃপাসিন্ধু সেকথা ভোলেননি। বরং আজকাল তাঁর বাবার জন্য দুঃখও হয়। ছেলের এই এত বড় লড়াই তাঁর নিজের চোখে দেখা হল না!

॥ ২ ॥

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে ছিল মেঘা। স্কুল থেকে একটু আগেই বাড়ি ফিরেছে সে। আন্টিদের কী একটা মিটিং ছিল বলে আজ দু' পিরিয়ড আগে ছুটি হয়ে গিয়েছে স্কুল। অন্যদিন হলে এ সময় বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় হুড়োহুড়ি করে মেঘা। রাস্তা মানে ওদের পাড়ার মধ্যের রাস্তা। সোনাই, খুশি, মিন্টুরাও আসে। ওদের সঙ্গে বিকেলে হইচই, ধরাধরি অথবা কুমিরডাঙা খেলা, তারপর সন্ধে হলেই ঘরে ঢুকে হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসা। আজ কিন্তু একটুও খেলতে যাওয়ার ইচ্ছে নেই মেঘার।

আসলে মনটা তার আজ বেজায় খারাপ। কিছু ভাল লাগছে না যেন। বারবার দিয়ার কথা মনে পড়ছে, ওর মুখখানা ভেসে উঠছে চোখের সামনে, আর জল ভর্তি হয়ে আসছে চোখে। দিয়া কি সত্যিই বাঁচবে না আর? ভাবলেই শিরশির করে ওঠে সারা শরীর। অথচ কী ভাল আর কী মিষ্টি মেয়ে দিয়া।

দিয়া মেঘার ছেলেবেলার বন্ধু। সেই শিশু শ্রেণি থেকে একই সঙ্গে একই স্কুলে পড়ছে ওরা। এখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা, মানে এখন যারা স্কুলে পড়াশোনা করছে, তাদের চেয়ে দু'-তিন ক্লাস আগে পড়ে, দিয়াকে চেনে না এমন একজনও নেই। দিয়া পড়াশোনায় ভাল, দিয়া দারুণ নাচে, এমনকী, স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় 'গো অ্যাজ ইউ লাইক'-এ দিয়া প্রতি বছর ফার্স্ট প্রাইজ পাবেই। দিয়া যে তার বন্ধু এ কথা ভাবলেই মনের মধ্যে কেমন যেন একটা গর্ব-গর্ব ভাব আসে। আর শুধু তো বন্ধু নয়, দিয়া আবার তার বেস্ট ফ্রেন্ড। সেই দিয়ারই যদি এমন একটা ভয়ানক অসুখ হওয়ার কথা শোনে মেঘা, যে অসুখে অধিকাংশ মানুষই নাকি বাঁচে না, তা হলে কি আর খেলতে যাওয়ার ইচ্ছে থাকে তার!

দিয়ার অসুখটা আগে থেকে কিচ্ছু বোঝা যায়নি। দিব্যি সুস্থ সবল মেয়েই তো ছিল সে। তিন-চার দিন আগে ক্লাস করতে-করতেই কী যে হল, দুম করে অজ্ঞান হয়ে বেঞ্চি থেকে পড়ে গেল ও। আন্টি দৌড়ে এসে ওকে তুললেন, অন্য মেয়েরাও ছুটে গিয়ে জল নিয়ে এসে ছিটিয়ে দিল ওর মুখে। দিয়ার বাড়িতে খবর গেল। বাড়ি থেকে লোকজন এসে নিয়ে গেলেন ওকে। সেই যে বাড়ি গেল,

তারপর থেকে আর স্কুলে আসেনি দিয়া।

আজ ক্লাসরুমে আসা নোটিসটা যখন ভীষণ গম্ভীর মুখে জোরে-জোরে পড়ছিলেন মহুয়াআন্টি, তখনই জানতে পারল মেঘা যে, কী একটা কঠিন অসুখ করেছে দিয়ার। আর সেই অসুখ থেকে সেরে ওঠার জন্য যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা জটিল অপারেশন করাতে হবে দিয়ার, যে অপারেশন অত্যন্ত ব্যয়বহুল। যেহেতু দিয়াদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, তাই হেডমিস্ট্রেসআন্টি স্কুলের সব মেয়ের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন, দিয়ার জন্য সাধ্যমতো অর্থ সাহায্য করতে।

মেঘার কাছে সবসুদ্ধ দশ টাকা ছিল। পুরোটাই দিয়ার জন্য দিয়ে স্কুল থেকে হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ি ফেরার সময়ই মিষ্টুর মা, কাকিমার কাছে সে শুনেছে যে, এই অপারেশনের জন্য যত টাকা দরকার তা জোগাড় করা নাকি প্রায় অসম্ভব, বিশেষত এই অল্প সময়ে। তা ছাড়া টাকাটা জোগাড় হলেও, দিয়া যে বাঁচবেই এমন কোনও গ্যারান্টি নাকি ডাক্তাররা দিতে পারছেন না।

দিয়া যে আর না-ও বাঁচতে পারে, এ কথাটা আবার মনে পড়ায় বুকের মধ্যেটা মোচড় দিয়ে ওঠে মেঘার। চোখ থেকে জল গড়িয়ে এসে নিঃশব্দে বয়ে চলে তার দু' গালের উপর দিয়ে।

সন্ধেবেলা পড়াশোনায় মন বসে না মেঘার। রাত্রিবেলা খাবার টেবিলে একটাও কথা বলেনি সে। অন্য দিন খেতে বসে খলবল করে এত কথা বলে যে মেঘা, আজ তাকে এমন মনমরা দেখে ওর কাঁধের উপর বাঁ হাত দিয়ে আলতো চাপড় মারেন ওর বাবা। তারপর জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "কী হয়েছে মেঘা?"

বাবার দিকে তাকিয়ে কিছু বলার আগেই ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে মেঘা। মেঘার বাবা থতমত খেয়ে যান। তারপর নরম গলায় আবার জিজ্ঞেস করেন, "কী হয়েছে?"

"দিয়াটা আর বাঁচবে না বাবা!" বলতে-বলতে ডুকরে কেঁদে ওঠে মেঘা।

"ছিঃ।ও কথা বলতে নেই মা!"

"সকলেই যে বলছে!" আবার বলে মেঘা।

"ওরা ভুল বলেছে মেঘা, দিয়া নিশ্চয়ই বাঁচবে।" ওর বাবা সান্ত্বনা দেন।

"তুমি ঠিক বলছ বাবা?"

"হ্যাঁ মা!"

মেঘা একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর আবার বলল, "কিন্তু দিয়ার অপারেশনে যে অনেক টাকা লাগবে বাবা, দিয়ারা তো গরিব। অত টাকা যদি জোগাড় না হয়?"

"ব্যবস্থা একটা কিছু ঠিকই হয়ে যাবে মা।"

"কীভাবে?"

"ঈশ্বর ব্যবস্থা করবেন।"

"যদি না হয়?"

"হবেই।"

"না হলে তুমি দেবে বাবা?"

"অত টাকা যে আমারও নেই মা।"

"তা হলে?"

"আমরা সকলে মনে-মনে আকুল প্রার্থনা জানাব যাতে টাকাটা তাড়াতাড়ি জোগাড় হয়।"

"প্রার্থনা জানালে হবে?"

"নিশ্চয়ই হবে।"

রাতে বিছানায় শুয়ে দিয়ার জন্য এক মনে প্রার্থনা জানাতে থাকে মেঘা। আর প্রার্থনা জানাতে-জানাতে ঘুমিয়েও পড়ে এক সময়।

॥ ৩ ॥

কী একটা অদ্ভুত অস্বস্তিতে মেঘার ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে যায়। এখন যে ঠিক কত রাত কে জানে! সারা বাড়িই একেবারে নিঝুম, থমথমে। আগে সে মা-বাবার সঙ্গে একটা ঘরেই শুত রাত্রিবেলায়। এ বছর থেকেই সে একটা আলাদা ঘরের মালিক হয়েছে। এই ঘরটাই তার একেবারে নিজস্ব পৃথিবী। নিজের চেয়ার, টেবিল, বইপত্তর। দেওয়াল-ভর্তি অনেক পোস্টার। কোনওটা সানিয়া মির্জা তো কোনওটা সচিন তেন্ডুলকর। তবে মেঘার সবচেয়ে প্রিয় চরিত্র হ্যারি, হ্যারি পটার। হ্যারির একটা বিশাল পোস্টার সে তাই একেবারে তার পড়ার টেবিলের সামনের দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে যত্ন করে।

এই যে তার সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা ঘর, বা সে যে রাতেও মায়ের সঙ্গে না শুয়ে একদম একা-একা ঘুমোয় নিজের ঘরে, এই নিয়ে বন্ধুমহলে তার প্রতি অনেকেরই বেশ একটা সম্ভ্রম-সম্ভ্রম ভাব আছে। মেঘা সেটা জানে, আর জেনে বেশ একটা বাড়তি আনন্দও পায় মনে-মনে। কিন্তু আজ রাতে এই হঠাৎ ভাঙা ঘুমে কেমন যেন একটু ভয়-ভয় করতে লাগল তার। যদিও সে খুব বেশি ভিতু নয়, তবু গা-টা যেন ভীষণ ছমছম করতে লাগল তার। হঠাৎ একটা ভীষণ হাল্কা অথচ স্পষ্ট শব্দে বাঁ দিকে পাশ ফিরে তার পড়ার টেবিলের দিকে চোখ ফেরাল মেঘা। আর তখনই চেয়ারটার একেবারে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা একটা মানুষের আবছা অবয়ব চোখে পড়ল তার।

ভীষণ ভয় পেয়ে গেল মেঘা। ভূত-প্রেত-দত্যি-দানোর গল্প সে অনেক শুনেছে, কিন্তু সত্যি-সত্যিই যে এমন ভয়ংকর ভুতুড়ে ব্যাপারস্যাপার ঘটতে পারে, তা সে ভাবতেই পারেনি কোনওদিন। এমন কথা কখনও যদি মনে আসত একবার, তা হলে কী মেঘা একলা-একলা শোওয়ার কথা ভাবত! নিদারুণ আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে গেল মেঘা, যাতে পাশের ঘরে ঘুম থেকে জেগে উঠে দৌড়ে চলে আসতে পারেন তার বাবা-মা এই দুঃসময়ে তাকে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, প্রাণপণ চেষ্টা করেও মেঘা তার গলা থেকে একটুখানি আওয়াজও বের করতে পারল না। মনে হল, গলা শুকিয়ে কাঠ। হাত, পা-ও অসাড়। যেন দেহের কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গই এখন আর তার ইচ্ছাধীন নয়। নির্বাক ও নিস্পন্দপ্রায় মেঘা চুপ করে তার বিছানার উপর শুয়ে থাকে সেই অদ্ভুত অপার্থিব ছায়ামূর্তিটির দিকে চোখ রেখে।

মূর্তিটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘরের ভিতরের হাল্‌কা আলোয় এখন লোকটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল মেঘা। লম্বা, ফরসা, মাথায় কোঁকড়ানো বাবরি চুল, চোখে গোল সরু ফ্রেমের চশমা, যার থেকে দড়ির মতো কী একটা ঝুলে আছে। পরনে বেশ ধোপদুরস্ত ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবি। লোকটা মেঘার দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল। বলল, "ভয় পেও না।"

লোকটার গলার স্বর গম্ভীর। তবু তার কথার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যার জন্য মেঘার ভিতর থেকে ধীরে-ধীরে সেই ভয়ংকর আতঙ্কের ভাবটা মিলিয়ে যেতে লাগল। ক্রমশ সহজ হয়ে আসতে লাগল তার শরীর। লোকটা ধীর পায়ে



তার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর আবার বলল, "ভয় পেও না।"

মেঘা সত্যিই ভয় পেল না আর। ধীরে-ধীরে মশারির মধ্যে উঠে বসল সে। তার সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী নাম তোমার খুকি?"

"আমার নাম মেঘা।"

"বাঃ, খুব সুন্দর নাম তোমার।"

মেঘা খুশি হল। সাহসও পেল। লোকটার মুখের দিকে চেয়ে সে বলল, "তুমি ঘরের মধ্যে কী করে ঢুকলে?"

"দরজা দিয়ে।" বলে মেঘার ঘরের খোলা দরজাটার দিকে দেখাল লোকটা।

"তা নয়, তা নয়।" মেঘা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আমি জিজ্ঞেস করছি যে, তুমি আমাদের বাড়ির মধ্যে ঢুকলে কী করে? দরজা তো সব বন্ধ?"

"দরজা বন্ধ থাকলেও আমার এখন কোথাও ঢুকে পড়তে কোনও বাধা নেই।" মুচকি হেসে লোকটা বলল।

"তুমি কী বন্ধ দরজা খুলে ফেলতে পার? যেমন আমাদের পাশের বাড়িতে একবার চোর এসেছিল!"

"ছিঃ, ছিঃ, কী যে বলো তুমি মেঘা!" মেঘাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে লোকটা, "আমাকে কী তুমি চোর-ডাকাত ঠাওরালে নাকি?"

"না, না, ঠিক তা নয়," একটু অপ্রস্তুত গলায় বলল মেঘা, "আসলে দরজা বন্ধ থাকলে কি মানুষ তা ভেদ করে ঢুকে পড়তে পারে, বলো?"

"তা ঠিক।" লোকটা মেঘার কথায় সায় দিল।

"সে জন্যই তো আমি তোমাকে...।"

"আহা, আমি কি আর মানুষ যে, দরজা বন্ধ থাকলে ঢুকতে পারব না ঘরের মধ্যে?" মেঘাকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল লোকটা।

লোকটার কথা শুনে মেঘা আঁতকে উঠল, "বলো কী, তুমি তা হলে মানুষ নও?"

"উঁহু।"

"তা হলে কি তুমি ভূত?"

"ভূত মানে কি তুমি জানো মেঘা?"

"হুঁ-উ-উ।"

"কী বলো তো?"

"ওরেব্বাবা, সে একটা বিচ্ছিরি জিনিস, খুব ভয়ংকর। আমার তো ভূতে খুব ভয়।"

"কই আমাকে দেখে কি এখন খুব ভয় করছে তোমার?"

"তা করছে না ঠিক। তবে প্রথমটা করেছিল।"

"আসলে ভূত মানে অতীত, মানে আগে যা ছিল। সে অর্থে সত্যিই আমি ভূত, মেঘা। কেননা, একদিন আমি তোমাদের মতো মানুষই ছিলাম। আমার দেহ ছিল রক্তমাংসের।"

"আর এখন?"

"এখন নেই।"

"তা হলে আমি যে তোমায় দেখছি?" পরম বিস্ময়ে বলে ওঠে মেঘা।

"যেটা দেখছ সে শরীরটা আসলে ভেদ্য। এটা একটা মায়াশরীর। তোমাকে দেখাবার জন্য জোর করে এটাকে তোমার সামনে ভাসিয়ে রেখেছি আমি।"

"কেন?"

"আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি মেঘা।"

"কী ব্যাপারে?"

"তোমার বন্ধু দিয়ার চিকিৎসার ব্যাপারে।"

"তুমি কি দিয়ার চিকিৎসার খরচ দেবে?" বিপুল আগ্রহে সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করে মেঘা।

"দিতে পারলে তো খুবই খুশি হতাম মেঘা, যত দিন দেহে ছিলাম, মানুষের যে-কোনও প্রয়োজনে একটুও কার্পণ্য না করে দু' হাতে টাকা ঢেলেছি আমি। কিন্তু...।"

"কিন্তু কী?" উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল মেঘা।

"কিন্তু এখন যে আমি দেহে নেই, আর আমার টাকাও নেই।"

"তা হলে?"

"সেটাই ভাবছি মেঘা। ভেবে উপায় তো একটা বের করতেই হবে। আসলে কী জানো, রাতে শুতে এসে এত আন্তরিকভাবে বন্ধুর জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছিলে তুমি যে, সে দুঃখ, সে আন্তরিকতা যেন আমাকে টেনে নিয়ে এল এখানে। যদি আমার সত্যিকারের চোখ থাকত, তা হলে তোমার কষ্টে নির্ঘাত কেঁদেই ফেলতাম আমি।"

লোকটার কথা শুনতে-শুনতে মেঘারই চোখে জল এসে গেল। কান্নাভেজা গলায় সে বলল, "দিয়া আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। ও যদি আর না বাঁচে!"

"অবশ্যই বাঁচবে।" ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল লোকটা।

"কিন্তু অত টাকা?"

"দাঁড়াও-দাঁড়াও।" বলে চিন্তিত মুখে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করল লোকটা। তারপর হঠাৎ একপাক ঘুরে মেঘার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "হয়েছে।"

"কী হয়েছে?" আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল মেঘা।

"উপায়।"

"সত্যি?"

"হুঁ।"

"কী উপায়?"

মেঘার প্রশ্নটাকে পাত্তা না দিয়ে লোকটা বলল, "আচ্ছা মেঘা, তোমাদের আশপাশে বিত্তবান অথচ খুব বেশি দায়দায়িত্ব পালন করতে হয় না, এমন কোনও লোক নেই?"

"কেন বলো তো?"

"কেন'র উত্তর পরে। আগে লোকটার সন্ধান দাও।"

"কে জানে!" বলে ঠোঁট ওলটায় মেঘা।

"উঁহু উঁহু, কে জানে বললে হবে না। ভাল করে ভাবো। ভেবে বলো।"

মেঘা খুব মন দিয়ে ভাবে খানিক। প্রথমটা কারও নামই সেভাবে মনে আসতে চায় না। তারপর হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো লোকটার কথা মাথায় এসে যায় তার। উজ্জ্বল চোখে সে বলল, "একজন আছেন।"

"কে?" লোকটা জিজ্ঞেস করল গম্ভীর কণ্ঠে।

"কৃপাসিন্ধুকাকু।" মেঘা বলল।

"তিনি কে?"

"আমাদের পাড়াতেই থাকেন। আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডান হাতে খান পাঁচেক বাড়ি পেরিয়ে, বাঁ দিকে ঢুকে, গোটা ছয় বাড়ির পরে, বাঁ দিকে। রংচটা একতলা বাড়ি। একাই থাকেন। বিয়ে-থা করেননি।"

"বিত্তবান মানুষ?"

"সকলে বলে ওঁর নাকি লক্ষ-লক্ষ টাকা। কিন্তু...।"

"কিন্তু?"

"কিন্তু অসম্ভব কৃপণ। হাত দিয়ে জল গলে না।" হতাশ গলায় বলল মেঘা।

"এবার গলবে।" লোকটা হেসে বলল।

"কীভাবে?"

"উনি যে ভঙ্গিতে জীবনটাকে দেখেন, সেটা পালটে দিতে হবে।"

"কী করে?"

"দেখা যাক।" বলে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল লোকটা।

হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় লোকটাকে ডাকল মেঘা, "এই শোনো।"

"বলো।" লোকটা ঘাড় ফেরাল ওর দিকে।

"তুমি কে, বলবে না আমায়?"

"আমার নাম তুমি হয়তো শুনেছ।" লোকটা হাসল।

"কী নাম তোমার?"

"শ্রী গৌরী সেন।" বলতে-বলতে হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেল লোকটা।

গৌরী সেন নামটা ভারী চেনা-চেনা লাগল মেঘার। কিন্তু ঠিক কোথায় যে শুনেছে নামটা, মনে করতে পারল না সে। বিছানায় শুয়ে নামটার কথা ভাবতে-ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল মেঘা।

॥ ৪ ॥

কৃপাসিন্ধু অফিস ছুটির পর আরও অনেকটা সময় বাইরে-বাইরে কাটিয়ে একটু রাত করেই বাড়ি ফিরছিলেন। আসলে গত ক'দিন ধরে এলাকায় ভারী একটা গোল বেধেছে। লোকমুখে তিনি শুনেছেন যে, এ অঞ্চলেরই একটা ছোট্ট মেয়ে কী যেন এক কঠিন অসুখে পড়েছে। এখনই অপারেশন না করালে তার নাকি আরোগ্যের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অপারেশনের খরচও যে প্রচুর! কাজেই এলাকার কিছু ছেলে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে অর্থ সংগ্রহের কাজে।

খবরটা শোনা ইস্তক বড় শঙ্কার মধ্যে আছেন কৃপাসিন্ধু। রাতে যেন ঘুম আসতে চাইছে না তাঁর। সব সময় একটা চাপা টেনশন ঘুরপাক খাচ্ছে মনের মধ্যে। এই বুঝি তাঁর কাছেও অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে এল ছেলেগুলো। শিউরে উঠে কয়েন জমানোর বাক্সটার কাছে গিয়ে দাঁড়ান কৃপাসিন্ধু। গভীর রাতে সস্নেহে হাত রাখেন বাক্সগুলোর গায়ে। কখনও-কখনও আলমারি খুলে ব্যাঙ্কের চেক বই আর পাশ বই বের করে দু' হাতে শক্ত করে ধরে বসে থাকেন তিনি চুপটি করে, আর ভাবেন, ছেলেগুলো কতখানি আহাম্মক। আরে বাবা জীবন-মৃত্যু কি মানুষের হাতে? কথায় বলে, 'রাখে হরি মারে কে, আর মারে হরি রাখে কে', কাজেই ঈশ্বর চাইলে ও মেয়ে তো এমনিই বাঁচবে। তাঁর মতো মানুষকে এসব তুচ্ছ ব্যাপারে এভাবে বিপন্ন করার কী অর্থ বাপু! মূলত ওই ছেলেগুলোর ভয়ে কৃপাসিন্ধু এখন প্রায় পালিয়েই বেড়াচ্ছেন সর্বক্ষণ। সূর্যের আলো ভাল করে ওঠার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ছেন, আর ফিরছেন যখন, তখন রাত নিশুত, এলাকা শুনশান।

তবু সাবধানের মার নেই। পাড়ার মধ্যে ঢুকেই তাই সাবধানি চোখে এ পাড়া ও পাড়া ভাল করে দেখে নিলেন কৃপাসিন্ধু, যদি কেউ রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়েটাঁড়িয়ে থাকে এখনও! তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললেন বাড়ির দিকে। বাড়ির প্রায় কাছাকাছি যখন পৌঁছে গিয়েছেন, হঠাৎ ব্যাপারটা নজরে পড়ল তাঁর। তাঁর বাড়ির একটু তফাতেই যে ল্যাম্পপোস্টটা, তার গায়ে কী যেন একটা পোস্টার সাঁটা। ভোটটোট থাকলে এ ধরনের নানান পোস্টার হামেশাই পড়ে, কিন্তু এ সময় তো সামনে ইলেকশন-টিলেকশন কিছু নেই। একটু কৌতূহলী হয়ে পড়লেন কৃপাসিন্ধু।

ধীর পায়ে দাঁড়ালেন গিয়ে পোস্টারটার সামনে। সেটাকে পড়ারও চেষ্টা করলেন খানিক, কিন্তু একে স্ট্রিট লাইটের ক্ষীণ আলো, তাও আবার পোস্টারের হরফগুলো যেন ঠিক মানানসই আয়তনের নয়। তা ছাড়া বছর দুই ধরে তাঁর চোখের দৃষ্টিটাও যেন ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে। চশমা নেওয়াটা খুবই যে প্রয়োজন, কৃপাসিন্ধু নিজেও সেটা অনেক দিন আগেই বুঝেছেন, কিন্তু ফালতু কিছু পয়সা খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে ওদিকে আর মাড়াননি। তবে সমস্যাটা ইদানীং যেন বড্ড মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এক দেখতে অন্য দেখছেন, কখনও বা একেবারে দেখতেই পাচ্ছেন না অনেক কিছু। ক' মাস ধরে অফিসেও বড়বাবুর বিস্তর বকাঝকা সহ্য করতে হচ্ছে কৃপাসিন্ধুকে। ল্যাম্পপোস্টটার নীচে পোস্টারটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে মনের কষ্টে বুক খালি করা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন কৃপাসিন্ধু। আর বোধ হয় রক্ষে করা গেল না। চশমা একটা বানাতেই হবে। আর চশমার জন্য কিছু অর্থ চোখের ডাক্তারকেও উপঢৌকন দিতে হবে চশমা তৈরির খরচ ছাড়াও।

প্রবল দুঃখ বুকে নিয়ে বাড়ির উঠোনে পা রাখলেন কৃপাসিন্ধু। উঠোন পেরিয়ে উঠে পড়লেন বারান্দায়। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত গলিয়ে চাবি বের করলেন দরজার তালা খোলবার। চাবি তালার গর্তে ঢুকিয়ে ডান দিকে একটু চাপ দিতেই হাল্কা খুট আওয়াজ করে খুলে গেল তালাটা। কৃপাসিন্ধু ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন। রোজকার মতো হাতের ছোট্ট ব্যাগটা ছুড়ে দিলেন বিছানার দিকে, আর ঠিক তখনই বিছানার উপর তাঁর মাথার বালিশটার পাশে চশমাটাকে দেখতে পেলেন তিনি। গোল-গোল কাচ, সরু ফ্রেমের চশমাটা থেকে আবার কালো রঙের দড়ি ঝুলছে একটা। কৃপাসিন্ধু ছুটে গিয়ে চশমাটাকে হাতে তুলে নিলেন। আনমনে ওটাকে নাড়াচাড়া করতে-করতে ভয়ংকর একটা চিন্তা মাথায় এল তাঁর। তবে কি তাঁর অনুপস্থিতিতে কেউ ঘরে ঢুকেছিল? না হলে চশমাটা এল কী করে? তবে কি চোর...? কথাটা ভেবেই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল তাঁর।

পরক্ষণেই মনে হল, দরজা তো বন্ধই ছিল। তিনি নিজে হাতে তালা খুললেন এক্ষুনি। তবুও ঘরের জিনিসপত্রগুলো একবার সাবধানে মিলিয়ে নিলেন তিনি। সব ঠিকঠাক আছে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চশমাটাকে আবার হাতে তুলে নিলেন কৃপাসিন্ধু। তারপর একটুক্ষণ সেটাকে নাড়াচাড়া করে চোখে গলিয়ে নিলেন। আর চশমাটা চোখে গলিয়েই কৃপাসিন্ধু অবাক। চোখের সামনের সবকিছুই একেবারে স্পষ্ট, একেবারে ঝকঝকে। এত দিন ধরে দেখে আসা পরিচিত জিনিসগুলোও কেমন যেন অন্য রকম, কেমন উজ্জ্বল, কেমন সুন্দর!

চশমাটা চোখ থেকে খুলে গুছিয়ে বালিশের পাশে রাখলেন কৃপাসিন্ধু। চশমা বানানোর খরচ বাঁচিয়ে দিলেন বলে হাত জোড় করে কৃতজ্ঞতা জানালেন ঈশ্বরকে। তারপর রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে ভারী নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি অনেক দিন পর।

॥ ৫ ॥

গত দু'-তিন রাত ভাল করে কাটার



আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ছিলেন কৃপাসিন্ধু পাড়ার লোকজনের নজর এড়িয়ে। আজও তিনি যখন শয্যা ছাড়লেন, বাইরে ভাল করে আলো ফোটেনি। দ্রুত হাত-মুখ ধুয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে জামাকাপড় গায়ে চাপিয়ে সন্তর্পণে চশমাটাকে হাতে তুলে নিয়ে সেটার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন কৃপাসিন্ধু। তারপর সেটা ঝুলিয়ে নিলেন চোখে। আর কী আশ্চর্য, চশমাটা চোখে গলাতেই সমস্ত কিছু কীরকম যেন অন্য রকম ঠেকতে শুরু করল কৃপাসিন্ধুর কাছে। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা তোলপাড় করা আবেগ। মাথার মধ্যেও কী অপূর্ব সুন্দর এক রিনরিনে অনুভূতি।

বিস্মিত কৃপাসিন্ধু ঘর ছেড়ে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। রাত শেষে পুব দিক লাল করে সূর্য উঠছে তখন। পৃথিবীর উপরে ছড়িয়ে পড়ছে সেই আলো। পাখিরা হইহই করে বেরিয়ে পড়েছে বাসা ছেড়ে। এই সব কিছুর মধ্যে দাঁড়িয়ে আজ পৃথিবীটাকে যেন বড্ড বেশি ভাল লেগে গেল কৃপাসিন্ধুর। বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন তিনি। এই ভোরেও কোত্থেকে এক ভিখারিনি বালিকা এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে। শুকনো মলিন মুখ তুলে মৃদু কণ্ঠে প্রার্থনা জানাল সে, "বাবু, কিছু ভিক্ষে দেবেন?"

কৃপাসিন্ধু কখনও কোনও দিন কোনও ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেননি। কিন্তু আজ মেয়েটির মুখের দিকে এক মুহূর্ত নিস্পলক তাকিয়ে তিনি তাঁর প্যান্টের পকেট থেকে একখানা কুড়ি টাকার নোট বের করে মেয়েটির হাতে তুলে দিলেন। মেয়েটি নোটটাকে উলটেপালটে দেখল খানিক, তারপর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কৃপাসিন্ধুর মুখের দিকে। মেয়েটিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে মিষ্টি করে হাসলেন কৃপাসিন্ধু। তারপর স্নেহার্দ্র কণ্ঠে মেয়েটিকে বললেন, "আবার কাল সকালে এসো, কেমন!"

তাঁর দিকে একবার মাথা ঝুঁকিয়ে আপন মনে পথ হাঁটতে লাগল মেয়েটা। সেদিকে তাকিয়ে কেন কে জানে, কৃপাসিন্ধুর মনটা আনন্দে যেন ভরে উঠল আজ। শরীরটাও কেমন যেন হাল্কা আর চনমনে। মনের আনন্দে শিস দিতে-দিতে বাড়ির সামনের রাস্তায় পায়চারি করতে লাগলেন তিনি। হাঁটতে-হাঁটতেই একটা ল্যাম্পপোস্টের নীচে এসে থমকে দাঁড়ালেন কৃপাসিন্ধু। পোস্টের গায়ে কাল রাতে দেখা সেই পোস্টার। চুপ করে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে এক মনে পোস্টারটা পড়তে শুরু করলেন কৃপাসিন্ধু। পড়তে-পড়তে হু হু করে উঠতে লাগল তাঁর বুকের ভিতরটা, জল এসে গেল দু' চোখের তারার উপর।

দিয়া নামে একটা ছোট্ট মেয়ের ভয়ানক অসুখ। একটা ব্যয়বহুল অপারেশনে মেয়েটা সুস্থ হতে পারে। অথচ এই বিশাল ব্যয়বহনে তার পরিবার অক্ষম। কৃপাসিন্ধু মেয়েটাকে চিনতেও পারলেন। ওর বাবা দিবাকর মিত্র তাঁর পরিচিত। ওঁর বাড়ি থেকে দিবাকরের বাড়ি খুব বেশি দূরেও নয়। পোস্টারটার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বারবার দিয়ার মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছিল কৃপাসিন্ধুর। পোস্টারে জনসাধারণের কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন কৃপাসিন্ধু। কত টাকাই বা উঠবে এভাবে! ল্যাম্পপোস্টটার কাছ থেকে সরে এসে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন কৃপাসিন্ধু। দরজা খুলে ঘরে ঢুকে বিছানার তোশকের নীচ থেকে তাঁর ব্যাঙ্কের চেক বইটা বের করলেন গম্ভীর মুখে। কয়েন জমানোর বাক্সটার দিকে ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ভারী অদ্ভুত একটা চিন্তা মাথায় এল তাঁর এ সময়। এত টাকা তাঁর, কী হবে এই অর্থ, এই বিত্ত, আর কত দিনই বা আয়ু তাঁর!

চেক বইটা থেকে একটানে একটা পাতা ছিঁড়ে নিলেন তিনি। খসখস করে সই করলেন তিনি নির্দিষ্ট জায়গায়। অর্থের অঙ্ক না বসিয়ে সেই ফাঁকা চেকটা পকেটে ভরে ঘর থেকে রাস্তায় নেমে দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি দিবাকর মিত্রের বাড়ির দিকে।

॥ ৬ ॥

কৃপাসিন্ধু দত্তের মহানুভবতার খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে গিয়েছে এলাকা জুড়ে। যদিও তিনি নাকি প্রচারের বাইরেই থাকতে চেয়েছিলেন আন্তরিকভাবে। আসলে দিবাকর মিত্র আবেগ চেপে রাখতে পারেননি। একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে কৃপাসিন্ধু যখন এক উজ্জ্বল ভোরে দিয়ার চিকিৎসার সমস্ত খরচ তুলে দিয়ে এলেন দিবাকরের হাতে, পুরো ব্যাপারটা স্বপ্ন মনে হয়েছিল তাঁর। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী এ উপকারের কথা গোপন রাখতে পারেননি। এলাকায় খবরটা আরও চাঞ্চল্যকর। কেননা, অবিশ্বাস্যভাবে মানুষটার নাম কৃপাসিন্ধু দত্ত, যাঁর পরিচয় একজন অন্যতম কৃপণ হিসেবেই।

মেঘার বাবাও বাড়িতে বলছিলেন, "মানুষ চেনা সত্যিই বড় কঠিন। কৃপাসিন্ধুর নামে কত কথাই তো বলেছি এত দিন। কত কটূক্তিও করেছি ওর নামে। কিন্তু আপাত কার্পণ্যের আড়ালে মানুষটা যে সত্যিই কৃপাসিন্ধু, তা বোঝাই যায়নি কোনওদিন।"

মেঘা চুপ করে বসে তার বাবার কথা শুনছিল আর কী যেন একটা কথা ভাবছিল গভীর মনোযোগের সঙ্গে। হঠাৎ চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার। রাতের সেই অদ্ভুত আগন্তুককে হঠাৎই শনাক্ত করে ফেলেছে সে। সেই আগন্তুক, যে কৃপাসিন্ধুর মতো মানুষকেও পালটে ফেলতে পারে প্রয়োজনে, আর যে রহস্য এ পৃথিবীতে একমাত্র সে-ই জানে।

মেঘা তার বাবার দিকে তাকাল। একবার ভাবল এ রহস্য বাবার কাছে ফাঁস করে দেবে আজ। পরক্ষণেই সে মত বদলাল। বাবা যদি তার কথা বিশ্বাস না করেন! কাজেই প্রকৃত ঘটনার কথা চেপেই যায় সে। শুধু বহুল প্রচলিত একটা প্রবাদ উচ্চারণ করে সে হাসতে-হাসতে। যে প্রবাদ বাক্যটি তার বাবাকেও বলতে শুনেছে সে অনেকবার। এমনকী আজও সে যেই উচ্চারণ করেছে, "লাগে টাকা..."

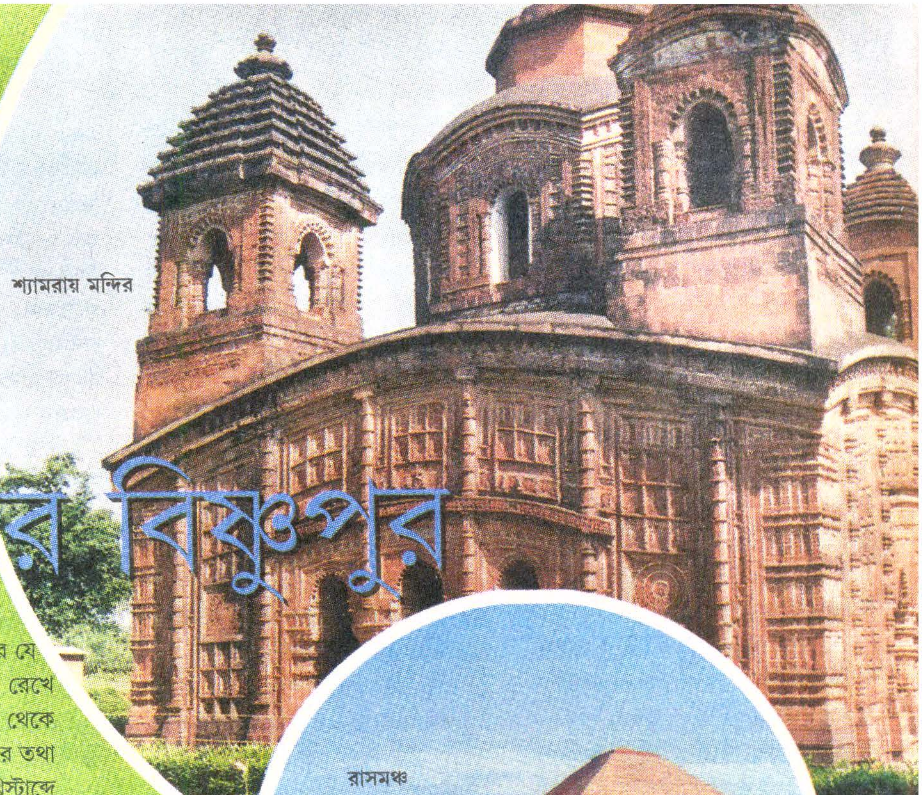
তার বাবাই বাক্যটি শেষ করে দিলেন, "দেবে গৌরী সেন!"

ছবি: অনুপ রায়

বেড়ানো

প্রাচীন টেরাকোটা শিল্পের অপূর্ব সব নিদর্শন! মন্দিরের পাশাপাশি আছে চোখ জুড়নো দলমাদল কামান। বিষ্ণুপুরে আজও ইতিহাস যেন কথা বলে। লিখেছেন **তমাল ঘোষ**

টেরাকোটার বিষ্ণুপুর



শ্যামরায় মন্দির

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পকলার যে অপরূপ নিদর্শন মল্লরাজারা বিষ্ণুপুরে রেখে গিয়েছেন, তার সময়কাল মোটামুটি ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। এই দু'শো বছর ছিল মল্লরাজাদের তথা বিষ্ণুপুরের স্বর্ণযুগ, বাংলারও বটে। আনুমানিক ৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা রঘুনাথ মল্লর হাত ধরে এই রাজবংশের সূচনা হয়। বীর হাম্বির ছিলেন এই বংশের ৪৯তম রাজা। বীর হাম্বিরের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে শ্রীচৈতন্য জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য শ্রীনিবাসের সংস্পর্শে। রাজা হাম্বির তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন আর সেই সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠেন।

ইতিহাসের পাতা থেকে এবার চোখ ফেরানো যাক বর্তমানের দিকে। বিষ্ণুপুরের যেসব প্রাচীন মন্দির পর্যটকদের আকর্ষণ করে, তার মধ্যে মল্লেশ্বর শিবমন্দির ছাড়া অধিকাংশই বৈষ্ণব মন্দির। এই সব মন্দিরের অধিকাংশই একরত্ন বা একচূড়া ধাঁচের। পাথরের তৈরি। তবে ইটের তৈরি মন্দিরও কিছু আছে। যদিও টেরাকোটার কাজের সূক্ষ্মতাই বিষ্ণুপুরের মন্দিরের মূল আকর্ষণ, তা সত্ত্বেও এর স্থাপত্যরীতি অসাধারণ। বিষ্ণুপুরের সবচেয়ে বিখ্যাত তিনটি পুরাতাত্ত্বিক স্থাপত্যের নিদর্শন হল রাসমঞ্চ, শ্যামরায় মন্দির আর জোড়বাংলা, যার আর-এক নাম 'কেষ্টরায় মন্দির'। এখন এই তিনটিই আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত। এ ছাড়াও এরকম প্রায় গোটা বিশেক মন্দির আছে।

রাসমঞ্চের স্থাপত্যশৈলী একটু অদ্ভুত। ঝামাপাথরের তৈরি প্রায় ৮০ ফুট চতুষ্কোণ বেদির উপর মঞ্চ, যার ছাদ পিরামিডের মতো। এর চার দিক ঘিরে রয়েছে ত্রি-স্তর অলিন্দ। রাস উৎসবের সময় বিষ্ণুপুরের সমস্ত বিগ্রহ এক জায়গায় প্রদর্শনের জন্যই রাজা হাম্বির ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে এই অভিনব রাসমঞ্চ তৈরি করিয়েছিলেন।

শ্যামরায় আর কেষ্টরায় মন্দির দু'টোর স্থাপত্যরীতিও অন্যরকম। কেষ্টরায় মন্দিরের বিশেষত্ব হল, জোড়বাংলার দু'টো দো-চালার উপর অতিরিক্ত একটি চারচালা শিখরের অবস্থান। কেষ্টরায় মন্দির বা জোড়বাংলা দেখে একটু এগোলেই চোখে পড়ে এরকমই একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এ পথে আর-একটু এগোলেই দরজা-জানলা বিহীন ইটের পাঁজার মতো গুমঘর। আর এর ঠিক উলটো দিকেই শ্যামরায় মন্দির। ভারতের শ্রেষ্ঠতম টেরাকোটা অলঙ্করণের নিদর্শন। মন্দিরটি পঞ্চরত্ন বা পাঁচ শিখরবিশিষ্ট, যার কেন্দ্রীয় চূড়াটি আটকোনা।



রাসমঞ্চ

ফোটো: লেখক

বিষ্ণুপুরের বারোটি একরত্ন মন্দিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বোধ হয় মদনমোহনের মন্দির। ইটের তৈরি এই মন্দিরটি তৈরি হয় মল্লরাজ দুর্জন সিংহের আমলে, ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে। অনেক মন্দির ল্যাটেরাইট পাথরেও তৈরি।

বিষ্ণুপুরের আরও অনেক আকর্ষণ রয়েছে। আছে বর্গীর দল মর্দনকারী 'দলমর্দন' বা দলমাদল কামান। ছিন্নমস্তা মন্দিরের পাশেই সাড়ে বারো ফুট লম্বা ও সাড়ে এগারো ইঞ্চি ব্যাসের এই কামানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কুলদেবতা মদনমোহনের কিংবদন্তি। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন টেরাকোটার নিদর্শনের পাশেই রয়েছে আজকের পোড়ামাটির হস্তশিল্প এবং বালুচরি শিল্প। আর পুরাতত্ত্বে আগ্রহী পর্যটকের কাছে বিষ্ণুপুরের একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'পুরাকীর্তি ভবন'।

কী ভাবে যেতে হয়: কলকাতা থেকে রেলপথে বিষ্ণুপুর ১৯৮ কিমি। হাওড়া থেকে সকালে ছাড়ে 'রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস' এবং 'আরণ্যক এক্সপ্রেস'। ঘণ্টাচারেকে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব।

থাকার জায়গা: পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের টুরিস্ট লজে যোগাযোগ করাই সব চেয়ে ভাল।

গল্পের শেষটা নতুন

গৌর বৈরাগী



ঘুম ভেঙে গেল গুনেন দত্তর। এখনও ভাল করে সকাল হয়নি। সূর্য উঠিউঠি করছে। অল্প-অল্প হাওয়া দিচ্ছে। সেই হাওয়ায় গাছের সবুজ পাতানাতা দোল খাচ্ছে। পাখি ডাকল বুঝি দু'-একটা। ফুলের গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। চারপাশে বেশ একটা ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব। গুনেন দত্ত দোতলার বারান্দায় পায়চারি করতে-করতে দেখলেন, পিসিমা পুজোর ফুল তুলতে বাগানে যাচ্ছেন।

হুড়মুড় করে নীচে নেমে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন গুনেন, "পিসিমা, এই মাত্তর একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে গেল।"

"কী হল রে গনু?"

"আজ কোকিলের ডাকে ঘুম ভাঙল আমার।"

"সব্বোনাশ!" গায়ে হাত রাখলেন পিসিমা, "শরীর ঠিক আছে তো গনু? সকালবেলাতেই অলক্ষুনে ডাক শুনলি তুই। ঠিক শুনেছিস তো!"

"হ্যাঁ পিসিমা, ঠিক শুনেছি।" ভয়ে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে গুনেন দত্তর।

সকলে ডাকে অবশ্য 'গনু উকিল' বলে। জজ কোর্টের এক নম্বর উকিল। বাদীপক্ষ, বিবাদীপক্ষ, তাঁকে সকলে ভয় পায়। সাক্ষীরা কাঁপতে-কাঁপতে সাক্ষ্য দিতে ওঠে। এমনকী, যিনি জজ কোর্টের হাকিম, তিনিও মাঝে-মাঝে বলেন, "গুনেনবাবু, একটা কথা ছিল।"

"কী কথা?"

"আপনাকে আর কষ্ট করে জেরা করতে হবে না। শেষমেশ রায় তো আপনার ফেভারেই যাবে।"

হাকিম হেসে বলেন, "আমি আগেই হুকুমটা দিয়ে দিই না হয়!"

তো এরকম সুনাম থাকলে যা হয়। মামলাবাজ লোকেরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গুনেন উকিলের কাছে। যেমন, একদিন বাদল মণ্ডল এসে বলল, "গত কাল ভুল করে একটা খুন করে ফেলেছি উকিলবাবু।"

"এ আর বেশি কথা কী বাদল! এটা বোধ হয় তোর পাঁচ নম্বর হল। তা যা করেছিস, করেছিস। টাকা ফেলে বাড়িতে গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমো এখন।"

পরের দিন এল হাতকাটা পঞ্চু, "স্যার, একটা ডাকাতি করে ফেলেছি।"

"তাতে হলটা কী, আমি তো মরে যাইনি পঞ্চু। গুনেন দত্ত থাকতে তোদের ভয়টা কীসের?"

কথাটা ঠিকই। সকলে জানে, গুনেন দত্ত খুনে-গুন্ডার বন্ধু। আর আইনের যম। ছেলেবেলায় লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিলেন। একবার রিডিং দিলেই মাথায় গেঁথে যেত পড়াটা। সেই ধারালো মাথায় আইনের মোটা বইগুলো এখন থাক দিয়ে সাজানো।

ভদ্রলোক আইন জানেন। সেই সঙ্গে জানেন আইনের ফাঁকফোকর। এরকম হলে যা হয়। খুনির খুন প্রমাণিত হয় না। ডাকাতি করেও আইনের জাল কেটে ডাকাত লকআপের বাইরে বেরিয়ে আসে। আর ওদিকে গুনেন উকিলের ঘরে টাকা জমে। জমতে-জমতে টাকার পাহাড় হয়ে যায়।

এর মধ্যেই আজ কোকিলটা কুহুকুহু করে বিচ্ছিরি ডেকে উঠল। গুনেন বললেন, "পিসিমা, কী হবে এখন!"

"কী আর হবে বাছা!" পিসিমা গায়ে হাত বুলিয়ে দেন গুনেনের, "আমি থাকতে তোমার ভয় কী! ব্যবস্থা করছি।"

কিন্তু কিছু ব্যবস্থা করার আগেই একটা গন্ধ নাকে আসে গুনেন উকিলের। "পিসিমা," বলে ডাক দেন তিনি।

"আবার কী হল গনু?"

"একটা গন্ধ পাচ্ছ তুমি?"

"সে কী! কোকিলের ডাকের সঙ্গে আবার গন্ধও জুটল নাকি!" নাক টানলেন পিসিমা, "হ্যাঁ, আমিও যেন পাচ্ছি। দাঁড়া-দাঁড়া," বলে হাঁটু মুড়ে খাটের নীচে দেখতে লাগলেন।

"ওখানে কী দেখছ আবার?"

"ইঁদুরফিঁদুর মরে পচেছে বোধ হয়। আমার হয়েছে জ্বালা! কাজের লোকগুলো যদি একটা কাজের হয়!"

"আহা ওখানে নয়, ওখানে নয়।" বলতে-বলতে খাটে আধশোয়া হলেন গুনেন, "গন্ধটা বাইরে থেকে আসছে।" তিনি মিনমিন করে বললেন, "হাওয়ায় ভেসে আসছে ফুলের গন্ধটা।"

পিসিমা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অবাক, "তুই তো ঠিকই বলেছিস গনু। এ কী অনাসৃষ্টি কাণ্ড দ্যাখ। আমাদের পাশের বাড়ির ছাদে গুচ্ছের গোলাপ ফুল ফুটেছে।"

"তাই নাকি, তাই নাকি! ওরা কারা পিসিমা?"

"ওরা নতুন ভাড়াটে। কালই এসেছে। আর সঙ্গে করে এনেছে ফুলগাছের বিদঘুটে শখটা।" পিসিমা মুখঝামটা দিলেন।

"ওই দেখ, ছাদভর্তি ফুলের টব। আর টবভর্তি গাছে থরে-থরে ফুল। লাল, কালো, হলুদ, গোলাপি। আর হাওয়া দিলেই গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে।"

পিসিমা বললেন, "গন্ধ তাড়াবার উপায় কী গনু?"

গুনেন বললেন, "আছে, আছে। দেশ থেকে আইন তো উবে যায়নি। দাঁড়াও, টের পাওয়াচ্ছি ওদের।" খাটে শুয়েই মোবাইলে রিং করলেন তিনি। তারপর বললেন, "হ্যালো, আমি গুনেন দত্ত বলছি।"

গুনেন দত্ত ডাকসাইটে উকিল। তাঁর জেরায় বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। থানার দারোগা তাঁর কাছে নস্যি। দারোগা শশী সামন্তর রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি। তাই সকালে ঘনঘন হাই তুলছেন। ফোনের ওপারে গুনেন দত্তর গলা পেয়ে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। লোকটা পুলিশের উপর বেজায় খাপ্পা। পুলিশকে সামনে পেলে জেরায়-জেরায় একেবারে জেরবার করে দেন। 'স্যার' বলে ডাকলেও কোনও মাপ নেই। তাই স্যারের সঙ্গে আজকাল গুনেন দত্তকে 'মিস্টার দত্ত' বলেও সম্বোধন করেন শশীদারোগা। যেমন এখন নরম গলায় বললেন, "সকালবেলায় কে ঝামেলা করল মিঃ দত্ত?"

"কে! তার মানে তুমি কিছুই জানো না শশী। মাসে-মাসে মাইনে দিয়ে তোমাদের পোষা তা হলে কীসের জন্য!"

"ভুল হয়ে গিয়েছে স্যার। মাপ চাইছি। এবার বলুন।"

গুনেন দত্ত মোবাইলে ঝাড়া সাড়ে তিন মিনিট লেকচার দিলেন। এক মিনিট কোকিলের ডাকের উপর। আড়াই মিনিট ফুলের গন্ধের উপর।

ফোনে লেকচার শেষ হতেই তড়পে উঠলেন শশীদারোগা, "এটা কী মগের মুলুক নাকি। আপনার বাড়ির পাশে ফুলের চাষ করবে! ইয়ার্কি নাকি। দেশে আইন নেই?"

গুনেন দত্ত বললেন, "কিন্তু আইনে ফুলের চাষ তো বারণ নয়।"

"হ্যাঁ, তা জানি স্যার। নিজের চাষ নিজে করবে তাতে আপত্তি নেই। গাছ নিজের, ফুলটাও নিজের। কিন্তু ফুল থেকে বেরিয়ে আসা গন্ধটা নিজের কাছে না রেখে তা ছড়িয়ে অন্যকে ডিসটার্ব করার কোনও অধিকার নেই কারও।"

"ঠিক, ঠিক।" গুনেন দত্ত যেন হাসলেন, "কিছু-কিছু আইন তুমিও শিখে ফেলেছ দেখছি।"

শশীদারোগা হাসলেন, "কার সঙ্গে ওঠাবসা করছি তা দেখবেন তো স্যার!"

একটু খুশি হলেন গুনেন দত্ত, "তা হলে আইন মোতাবেক একটা ব্যবস্থা করে ফ্যালো শশী।"

"সে আর বলতে!" শশীদারোগা উৎসাহে গমগমিয়ে বললেন, "আমি এখনই গাড়ি পাঠিয়ে টবসুদ্ধু সব ফুলগাছ সিজ় করে নিয়ে আসছি। আপনি ভাববেন না স্যার।"

গুনেন দত্ত বললেন, "গুড। কিন্তু কোকিলের কী হবে?"

"ওটা একটু ঝামেলায় ফেলবে মনে হয়। ব্যাটারা মগডালে বসে থাকে। প্রাণ হাতে করে মগডালে কাকে পাঠাই বলুন?"

গুনেন দত্ত অসহায়ভাবে বললেন, "তা হলে!"

"সে আপনাকে ভাবতে হবে না।" শশীদারোগা আশ্বস্ত করলেন, "আমি দমকলে একটা খবর দিচ্ছি। ওদের বেশ বড়-বড় মই আছে।"

॥ ২ ॥

এক ঘণ্টার মধ্যে ফুলসমেত আশিটা গোলাপের টব জমা পড়ল থানায়। অ্যারেস্ট হল দু'টো কোকিলও। কিছু পরে আবার মোবাইলে রিং করলেন গুনেন দত্ত। ওপ্রান্ত থেকে শশীদারোগা বললেন, "আবার কী হল মিঃ দত্ত?"

"ফুলের গন্ধে আর টেকা যাচ্ছে না। তারস্বরে দশ-বিশটা কোকিলও ডাকতে শুরু করেছে। আমাকে কি এবার দেশ ছাড়া করতে চাও তোমরা?" কান থেকে মোবাইল সরিয়ে একটা শ্বাস ফেললেন গুনেন। ডাকলেন, "পিসিমা, পিসিমা। এ তো আচ্ছা জ্বালাতন হল দেখছি।"

গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন পিসিমা, "তোর কী হয়েছে গনু? কাল থেকেই তোর ব্যাপারটা যেন কেমন বদলে গিয়েছে। তুই যা, নীচে চেম্বারে গিয়ে বোস। চোর-গুন্ডাগুলোর সঙ্গে থাকলে মন ভাল থাকবে তোর।"

তাই তো হয়ে আসছিল এত দিন। বাজার, হাট, মেঘ, বৃষ্টি আর ফুলের গন্ধটন্ধও তো কোনও দিন টের পাননি গুনেন উকিল। সকালে ঘুম ভাঙতেই যা দেরি। মক্কেল এসে বসে আছে। অপহরণ কেসের আসামি নিরাপদ দাস। খুনের মামলার এক নম্বর অভিযুক্ত চাঁদু। পকেটে তাড়াতাড়া নোট নিয়ে গুনেন দত্তর অপেক্ষায়। আজ এজলাসে ওদের মামলা উঠবে। ওরা টাকা দিয়ে খালাস। সেই টাকা একটা-একটা করে গুনবেন গুনেন দত্ত। মাঝে-মাঝে নাকের কাছে তুলবেন গন্ধ নিতে। আঃ, টাকার গন্ধ কী চমৎকার! তখন আকাশ দেখার সময় কোথায়? মেঘ এসে বৃষ্টি দিয়ে গেল এক পশলা, সেটা কী দেখার জিনিস! নরম ফিনফিনে শীত এসে রঙিন সোয়েটার বুনে দিল সকলকে। ফুলের গন্ধটন্ধও কী ভুল করে ঘরে ঢুকে পড়ত না! কিন্তু তখন নাকের ভিতর ভুরভুর করছে টাকার গন্ধ। সেখানে ফুল ঢুকবে কী করে! তো এরকম



সময়েই কাণ্ডটা ঘটে গেল।

কাণ্ড!

হ্যাঁ, একটা অন্য রকম কাণ্ড।

কী সেটা?

ওই যে একটা ছেলে, কালোমতো, হাফ পেন্টুল পরা। রোগা ডিগডিগে। বড়-বড় চোখে খানিক দুঃখু মেশানো। এই তো গত কালই, চেম্বার খালি করে মক্কেলরা সব চলে গিয়েছে। দশটা বাজছে। এবার চান-খাওয়া সেরে এজলাসে যাবেন গুনেন দত্ত। তখনই চোখ পড়ল ছেলেটার দিকে, "অ্যাই, তুই কে রে?"

"আমি স্বপন, জ্যাঠামশাই।"

জ্যাঠামশাই! বেশ চমকে উঠলেন গুনেন দত্ত। আশ্চর্য! গুনেন দত্ত কখনও 'লার্নেড অ্যাডভোকেট', কখনও 'স্যার', কখনও 'মাননীয় জুরি', কিন্তু কখনও 'জ্যাঠামশাই' নন। ছেলেটার দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, একটা ছেলে, রোগাসোগা, মাথার চুল রুখুসুকু। জামাটা ময়লা। গায়ে শীতের খড়ি ফুটেছে। "তুই কে?"

"আজ্ঞে, আমি স্বপন, জ্যাঠামশাই।"

"পড়িস?"

"হ্যাঁ, ক্লাস নাইনে পড়ি।"

"নাইনে!" দেখে তো মনেই হয় না। বেঁটেখাটো একরত্তি চেহারা। না বললে মনে হবে ফাইভ-সিক্স। মনে হল একটা গল্প। একটু-একটু মনে আসছে। কোথায় পড়েছি! কোথায় পড়েছি!

কিন্তু এখন কী এত ভাবার সময় আছে ছাই। গুনেন দত্ত বললেন, "আমার কাছে কী দরকার?"

প্রশ্ন শুনে মাথা নিচু করেছে ছেলেটা। যেন কিছু ভাবছে। পায়ের বুড়ো আঙুল ঘষছে মেঝেতে।

এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে। কাজের সময় এসব ঝামেলা ভাল লাগে কারও! আজ এগারোটায় মামলা উঠবে। সব ঠিক করা আছে। গুনেন দত্তর গলায় রাগ ফুটল, "আমার কাছে কী দরকার বললি না!"

ছেলেটা মুখ তুলল। চাপা গলায় ফিসফিস করল, "গেল সোমবার জজ কোর্টে একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্ডার হয়েছে।"

"হ্যাঁ হয়েছে, হয়েছে। তার সঙ্গে তোর কী?" চাপা রাগটা ভিতরে তখনও থমথম করছে গুনেন উকিলের। পরশু একটা অর্ডার হয়েছে বটে। এমন অর্ডার তো বড় একটা হয় না। হলে জানাজানি হয়। ঢিঢি পড়ে যায় চার দিকে। লোকটা বোধ হয় খুনের আসামি। নাম অবনী সরকার। কিন্তু এসব কথা আমার কাছে কেন! রাগ নিয়ে গুনেন দত্ত বললেন, "তা আমি কী করব?"

ছেলেটা যেন ভয় সরিয়ে হুট করে পায়ের কাছে বসে পড়ে বলল, "আপনি আমার বাবাকে বাঁচান জ্যাঠামশাই। বাবা খুন করেননি।" বলতে গিয়ে যেন কাঁদছে ছেলেটা। লজ্জায় কিংবা অপমানে চোখের কোলে জল।

ওই জলটা দেখেই আবার মনে পড়ে গেল গল্পটা ঠিক এরকমই না! কিন্তু কোথায় পড়েছি নাকি দেখেছি, দুর ছাই, এখন কি এসব মনে করার সময়! দাঁতে দাঁত চাপলেন গুনেন দত্ত, "মামলা লড়তে টাকা লাগে। কে দেবে টাকা?" কড়া চোখে তাকালেন তিনি।

ওই তাকানোর সামনে ছেলেটা গোবেচারা হয়ে গেল। গায়ে একটা পুরনো টেরিকটনের শার্ট।পায়ে কম দামি চটি, সারা গায়ে ধুলো। চোখে শুকনো জলের দাগ।

"কী রে, বললি না, কে দেবে টাকা? কে আছে তোর?"

"কেউ নেই। এক পিসি ছাড়া কেউ নেই জ্যাঠামশাই।"

উফ, গল্পটা নির্ঘাত পড়া। পেটে আসছে, মুখে আসছে না। কিন্তু গল্পের দিকে মন দিলে হবে না। দশটা কখন বেজে গিয়েছে। চান আজ আর হবে না। দু'টো মুখে দিয়েই গাড়ি চাপতে হবে। কোর্টে যেতে-যেতে এগারোটা বাজবে। সোজা এজলাসে। আজ মামলাটার ভাইটাল দিন। কিন্তু ছেলেটা এদিকে তাকিয়ে আছে। নিশ্চয়ই মনে-মনে লোক খুঁজছে। ভাল-ভাল লোক। বড়-বড় লোক। তেমন লোক তো কতই আছে আশপাশে। বাবার জন্য হাত পাতবে ভাবছে। কিন্তু কে দেবে টাকা? কে দেয়!

মনে-মনে হাসলেন গুনেন দত্ত, "বললি না, কে টাকা দেবে?"

ছেলেটা আস্তে-আস্তে মাথা তুলল। তার ভিজে চোখের তারা দু'টো এখন স্থির। চাপা গলায় বলল, "আজ্ঞে, আমি দেব জ্যাঠামশাই।"

"তুই!"

"হ্যাঁ।" ছেলেটা কচি গলায় ফিসফিস করল যেন। বলল, "তবে আজ পারব না। আগে বড় হই, তারপর।"

চমকে উঠলেন গুনেন দত্ত। তাঁর শরীরটা যেন কাঁপল হঠাৎ, "তোর নামটা কী যেন?"

"আমার নাম স্বপন সরকার।"

"কোন ক্লাসে পড়িস বললি যেন!"

"ক্লাস নাইন।"

"পড়াশোনায় লবডঙ্কা নিশ্চয়ই?"

স্বপন চাপা গলায় বলল, "আমি প্রতিবার ক্লাসে ফার্স্ট হই জ্যাঠামশাই।"

শুনতে-শুনতে ভিতরটা কাঁপছে দুঁদে উকিলের। এইমাত্র তাঁর মনে পড়ল। চল্লিশ বছর আগের গল্পটাই কি ফিরে এল নাকি! আশ্চর্য, ভারী আশ্চর্য। মিলে যাচ্ছে। সব মিলে যাচ্ছে। হারানো গল্পটা খুঁজে পেয়ে গলা গমগমিয়ে বেজে উঠেছিল গুনেন দত্তর। তাই শুনে হন্তদন্ত হয়ে উপর থেকে নেমে এসেছিলেন পিসিমা।

"ও গনু, এগারোটা বাজতে চলল, তুই যাবি না?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, যাব।" উত্তেজনায় তখন গলা কাঁপছিল গুনেন দত্তর, "তুমি দু' থালা ভাত বাড়ো আজ। এক থালা আমার, অন্যটা স্বপনের।"

ড্রাইভারকে গাড়ি নিয়ে ফিরে যেতে বললেন। অল্প-অল্প শীত রয়েছে। অর্ডিনারি জামার উপর পাতলা একটা চাদর জড়ালেন তিনি। হাত বাড়িয়ে স্বপনের একটা হাত ধরলেন। মুখে দু'টো দিয়েই পথে নামবেন দু'জনে।

পিসিমা অবাক, "তুই কোর্টে যাবি না গনু?"

"না।"

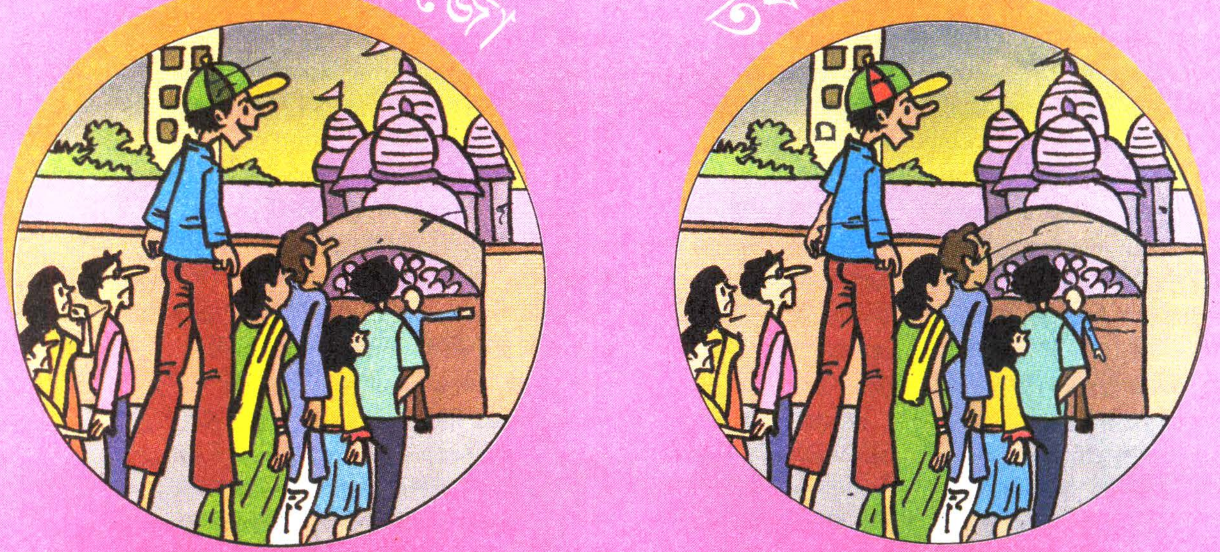
"তা হলে কোথায় যাবি?"

গুনেন হাসলেন, "চল্লিশ বছর আগের গল্পটার সঙ্গে আজ স্বপনের গল্পটা টোটো মিলে গেল পিসিমা। শুধু গল্পের শেষটা বাকি আছে এখনও। এর বাবাকে যদি না বাঁচাই, শেষটাও মিলে যাবে। তা হলে সারাজীবন ধরে একজন নাকে ফুলের গন্ধ পাবে না। কানেও তার কোনও দিন পৌঁছবে না কোকিলের ডাক।"

বলতে-বলতে স্বপনের হাত ধরে পথে নামলেন গুনেন দত্ত।

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

অমিল খোঁজো তফাত বোঝো



উপরের এই ছবি দুটি দেখতে একইরকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে অন্তত আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। *ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়*

হাসছি দ্যাখো

রমেনবাবু নতুন পাড়ায় বাড়ি কিনেছেন। বেশ খোলামেলা, শান্ত পরিবেশ। তবে আগের বাড়িওয়ালা বারবার করে বলে দিয়েছেন, পাড়ার সকলের সঙ্গে মিশলেও পাশের বিশাল প্রাচীর ঘেরা বাড়িটির দিকে যেন ভুলেও নজর না দেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করে রমেনবাবু জানতে পারলেন সেখানে পাঁচজন বৃদ্ধ থাকেন। তাঁরা পাড়ায় কারও সঙ্গে মেলামেশা করেন না।

নতুন বাড়িতে আসার পরের দিন সকালে হাঁটতে বেরিয়ে রমেনবাবুর কানে এল প্রাচীরের ওপার থেকে কারা যেন একসঙ্গে চেঁচিয়ে বারবার একই কথা বলছেন, "তেরো, তেরো, তেরো..."। কৌতূহল চাপতে না পেরে তিনি প্রাচীরের ধার ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। কিছুদুর গিয়ে প্রাচীরের গায়ে একটা গর্ত দেখে তিনি তাতে চোখ রাখলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে চোখে কারও আঙুলের তীব্র খোঁচা খেলেন। আর একই সঙ্গে শুনতে পেলেন, সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলছেন, "চোদ্দো, চোদ্দো, চোদ্দো..."।

প্রশ্ন: রেড হাউজ় লাল ইট দিয়ে তৈরি। ব্লু হাউজ় নীল ইট দিয়ে তৈরি হলে, গ্রিন হাউজ় কী দিয়ে তৈরি?
উত্তর: কাচ!

প্রশ্ন: কার একটাই চোখ, কিন্তু তবুও দেখতে পায় না?
উত্তর: সুচ!

প্রশ্ন: তোমার নিজের এমন একটা জিনিস, যা তোমার চেয়ে অন্যরাই বেশি ব্যবহার করে!
উত্তর: তোমার নাম।

প্রশ্ন: কী থেকে তুমি যত নেবে সেটা তত বেড়ে যাবে?
উত্তর: গর্ত। গর্ত থেকে যত মাটি তুলবে, তত বাড়তে থাকবে।

প্রশ্ন: কোন মাসে আঠাশ দিন হয়?
উত্তর: সব মাসে!

সাধারণ জ্ঞানের ক্লাসে শিক্ষিকা বিভিন্ন কোম্পানির স্লোগান নিয়ে প্রশ্ন করছিলেন। সকলেই ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারছিল। সকলের শেষে কমলকে শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করলেন, "বলো তো, 'কাজটা করে ফ্যালো' কাদের স্লোগান?"
কমল সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল, "মায়েদের।"

প্রশ্ন: একটা দেওয়াল আর-একটা দেওয়ালকে সবসময় কী বলে?
উত্তর: চল, আমরা কোনায় দেখা করব।

অর্থ শেখো

যে-কোনও জাতির সম্পদ তার মাতৃভাষা। আমাদের ভাল করে জানতে হবে সেই সম্পদের মণিমাণিক্যগুলো। নীচের শব্দগুলোর পাশে দেওয়া অর্থের যেটি ঠিক মনে হবে, সেটি দাগ দেবে।

মলমাস: (১) মঙ্গলদায়ক মাস। (২) মরামাস। (৩) যে-মাসে শুভ কাজ নিষিদ্ধ। (৪) মন্দ মাস।

তবিয়ত: (১) হৃদয়। (২) চিকিৎসা। (৩) শারীরিক অবস্থা। (৪) সেবা-শুশ্রূষা।

কাতার: (১) দল। (২) বড়ো আকারের দা। (৩) ব্যাকুল। (৪) আর্তস্বর।

ভজকট: (১) কুৎসিত। (২) জটিল ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। (৩) বেদনাদায়ক। (৪) বেআইনি।

ঝকমারি: (১) হঠকারিতা। (২) গোঁয়ার্তুমি। (৩) ঝামেলা। (৪) একগুঁয়েমি।

গত সংখ্যার উত্তর

জিন্নত: (২) স্বর্গ। 'জিন্নতবাসিনী জাহান-আরার স্মরণে।' (সৈয়দ মুজতবা আলী)

প্রাসাদ: (৪) রাজবাড়ি। 'দিল্লী প্রাসাদকূটে, হোথা বারবার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে টুটে।' (রবীন্দ্রনাথ)

বিধুমুখী: (৪) চন্দ্রমুখী। 'নিন্দ বিধাতারে তুমি তুমি নিন্দ বিধুমুখী।' (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

পরভৃৎ: (২) কাক। কোকিলের ঘরে এরা পালিত হয়।

তালিম: (৩) শিক্ষা। বাজনা শুনেই বোঝা যায় কোনও বড় ওস্তাদের তালিম আছে এর পিছনে।

স্কন্দগুপ্ত

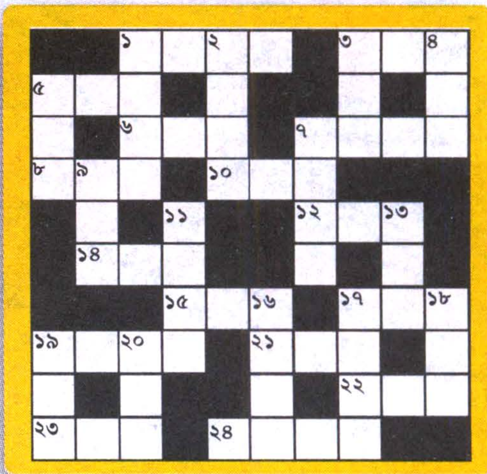
অমিল খোঁজো, তফাত বোঝোর উত্তর

(১) ছেলেটির টুপির রং আলাদা। (২) বাঁ দিকের মহিলার মুখে হাত নেই। (৩) ডান দিকের মহিলার ওড়নাটি ছোট। (৪) ছেলেটির বাঁ হাতের জামার হাতা ছোট। (৫) দরোয়ানের হাতের ভঙ্গি আলাদা। (৬) বাদামি চুল লোকটির নাক ছোট। (৭) মণ্ডপে একটি পতাকা কম আছে। (৮) পিছনে বাড়ির একটি জানলা নেই।

শব্দসন্ধান

সংকেত: পাশাপাশি

(১) জোগাড়, ব্যবস্থা, উদ্যোগ। (৩) অনেক ক্ষেত্রেই এর ফলে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়ে যায়। (৫) শক্ত, দৃঢ়, কঠোর। (৬) ক্ষুদ্র হাতা বিশেষ। (৭) প্রচণ্ড বর্ষণে ধান চাষিদের — দেখা দেয়। (৮) বাগান, উদ্যান। (১০) জামা-কাপড় ধোয়া এর কাজ। (১২) প্রশ্ন করলে যা দিতে হয়। (১৪) মিথ্যা, ঝুটা। (১৫) অল্পবয়সি মেয়ে। (১৭) বাতায়ন, যার মধ্য দিয়ে ঘরে আলো-বাতাস চলাচল করে।(১৯) গরুড় — পায় লাজ নাসিকা অতুল। (২১) কোমল, — মাটিতে বিড়াল আঁচড়ায়। (২২) বাদ্যকার, বাজনদার। (২৩) আমগাছ,আম। (২৪) দৌড়াদৌড়ি, ব্যস্ততা।



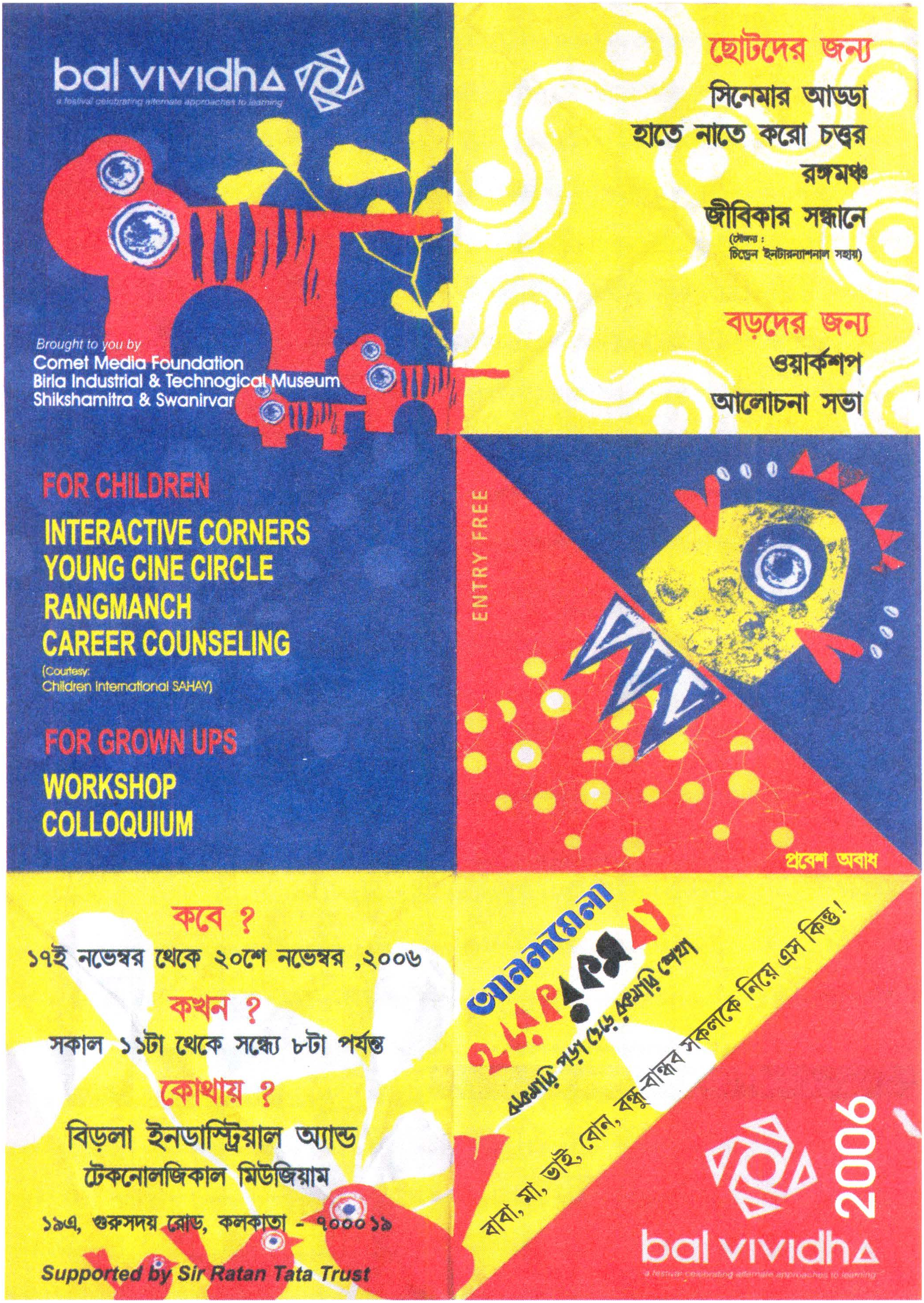
সংকেত: উপর-নীচ

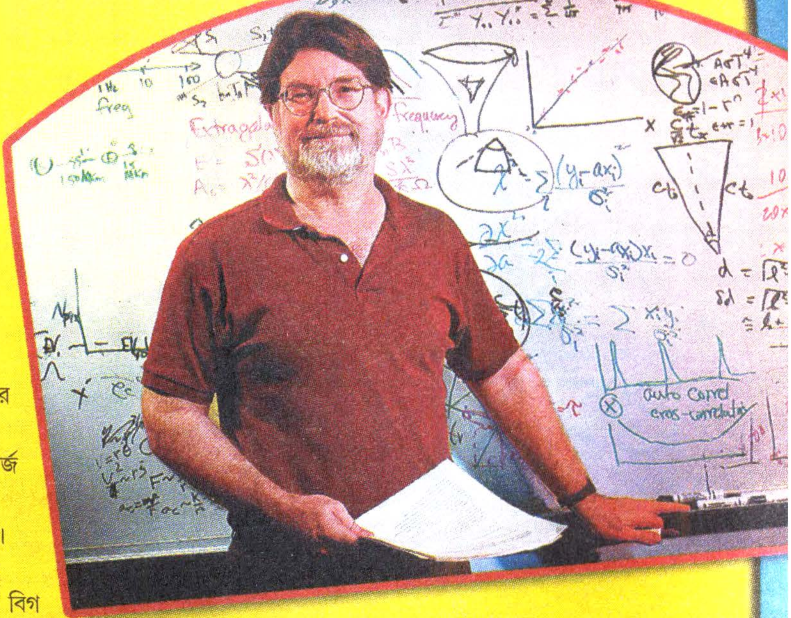
(১) আকুল, অস্থির, 'মা বলিতে প্রাণ করে—।' (২) জলের জীব। (৩) বিস্মিত, বাক্যহীন। (৪) কথা, বাক্য, উক্তি। (৫) অতি ক্ষুদ্র অংশ। (৭) নানা লোক,— গিজগিজ করছে বিয়েবাড়িতে। (৯) নতুন, অল্পবয়সি, তরুণ। (১১) যে মিথ্যা কথা বলে নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করে, চালিয়াত। (১৩) মুখ, মুখমণ্ডল, আনন। (১৬) নির্লজ্জ, বেহায়া। (১৭) কাঁসার বড়ো বাটি। (১৮) যে লজ্জা পায়, মুখচোরা, সহজে লোকের সঙ্গে মিশতে পারে না এমন। (১৯) সংবাদ, সকালে এর জন্যই দৈনিক পত্রিকার জন্য আকুল হয়ে থাকি। (২০) '— গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।'

দেবসেনাপতি

গত সংখ্যার সমাধান

ম	হা	ভা	র	ত		আ	য়ো	জ	ন
	ট		বি			হা			ব
	বা		ক	ষ্ট	ক	র			নী
	জা	হি	র		থ		ব	রা	ত
ভ	র	ত			ক	ম	ল		
		ক	র্দ	ম			বা	ক	ল
বা	ব	র		র		ম	ন	ন	
গ			বা	দ	শা	হ		ক	
ডো			র			র		ল	
র	সি	ক	তা		গী	ত	বি	তা	ন


bal vividha
a festival celebrating alternate approaches to learning
ছোটদের জন্য
সিনেমার আড্ডা
হাতে নাতে করো চত্বর
রঙ্গমঞ্চ
জীবিকার সন্ধানে
(সৌজন্য :
চিল্ড্রেন ইন্টারন্যাশনাল সহায়)
বড়দের জন্য
ওয়ার্কশপ
আলোচনা সভা
Brought to you by
Comet Media Foundation
Birla Industrial & Technogical Museum
Shikshamitra & Swanirvar
FOR CHILDREN
INTERACTIVE CORNERS
YOUNG CINE CIRCLE
RANGMANCH
CAREER COUNSELING
(Courtesy:
Children International SAHAY)
FOR GROWN UPS
WORKSHOP
COLLOQUIUM
ENTRY FREE
প্রবেশ অবাধ
কবে ?
১৭ই নভেম্বর থেকে ২০শে নভেম্বর ,২০০৬
কখন ?
সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যে ৮টা পর্যন্ত
কোথায় ?
বিড়লা ইনডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড
টেকনোলজিকাল মিউজিয়াম
১৯এ, গুরুসদয় রোড, কলকাতা - ৭০০০১৯
Supported by Sir Ratan Tata Trust
আনন্দমেলা
বাবা, মা, ভাই, বোন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে নিয়ে এস কিন্তু!
2006
bal vividha
a festival celebrating alternate approaches to learning



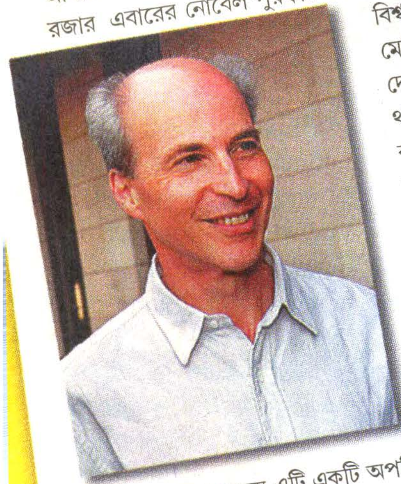
পদার্থবিজ্ঞান

ভয়ংকর এক বিস্ফোরণ, যার নাম 'বিগ ব্যাং'! এই বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এনার্জি বা শক্তি, যার নাম কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন। সেই এনার্জি ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। এর পর সেই এনার্জি থেকে তৈরি হতে শুরু করে গ্যালাক্সির মতো মহাজাগতিক সব কান্ড। এই ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন সংক্রান্ত রহস্যের সমাধান করে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির গবেষণায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন দুই মার্কিন বিজ্ঞানী, জন সি ম্যাথার এবং জর্জ এফ স্মুট (ডান দিকের ছবি)। নাসার কৃত্রিম উপগ্রহ 'কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সপ্লোরার'-এর সাহায্যে এই গবেষণা করেছিলেন তাঁরা। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ৩,৮০,০০০ বছর পর মহাবিশ্ব ঠিক কীরকম ছিল? এই উপগ্রহের সাহায্যে গবেষণা করে তা জানতে পেরেছেন দুই বিজ্ঞানী। বিগ ব্যাং-এর ফলে তৈরি শক্তি এখনও ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, কিন্তু সব জায়গায় সমানভাবে নয়। কোথাও কম, কোথাও বা বেশি। এই কম-বেশির পরিমাণও ধরা পড়েছে ম্যাথার ও স্মুট-এর গবেষণায়।

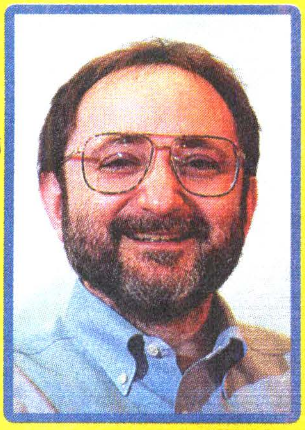
বিজ্ঞানে এবারের নোবেল

রসায়ন

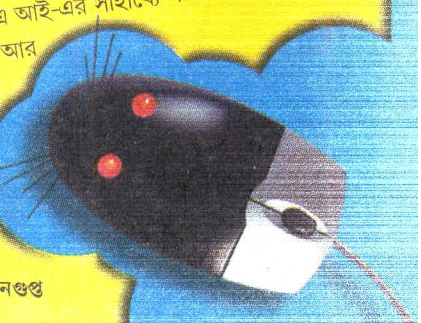
বাবা আর্থার কর্নবার্গ ছিলেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। ১৯৫৯ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। তখন কি আর্থার জানতেন, তাঁর ছেলে রজারও নোবেল পাবেন কোনওদিন? রজার এবারের নোবেল পুরস্কার পেলেন রসায়নে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ মেডিসিন-এর এই গবেষক দেখিয়ে দিলেন জিনে যেসব তথ্য থাকে, আর এন এ কীভাবে তা কপি করে পৌঁছে দেয় বিভিন্ন অঙ্গে, যেখানে কোষের বিভিন্ন অংশ প্রোটিন উৎপাদন করে। এর নাম 'ট্রান্সক্রিপশন'। এই জৈবিক প্রক্রিয়ার সঠিক বর্ণনা দেওয়ার জন্য রয়াল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস নোবেল পুরস্কার দিল তাঁকে। কোষ বেড়ে ওঠা এবং মানুষের বেঁচে থাকার জন্য এটি একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া যদি কোনওভাবে বাধা পায়, তা হলে ক্যানসার থেকে শুরু করে হৃদরোগ বা নানা ধরনের অসুখ হতে পারে। এই সব অসুখ ঠিকঠাক ডায়াগনোসিস করে, তা সারিয়ে তুলতে মার্কিন বিজ্ঞানী রজার কর্নবার্গের (সঙ্গের ছবি) এই গবেষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।



চিকিৎসাবিজ্ঞান



চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য এবারের নোবেল পুরস্কার পেলেন মার্কিন বিজ্ঞানী ক্রেগ মেলো ও অ্যান্ড্রু ফায়ার (ডান দিকের ছবি)। আর এন এ অর্থাৎ রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (Ribonucleic Acid)-কে মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়ে ভয়ংকর সব ভাইরাস ধ্বংস করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন তাঁরা। এই পদ্ধতির নাম 'আর এন এ ইন্টারফেয়ারেন্স'। এই আবিষ্কারের সাহায্যে সারিয়ে তোলা সম্ভব হবে এড্স, হেপাটাইটিস, পোলিও, বার্ড ফ্লু প্রভৃতি অসুখ। ক্যানসারের চিকিৎসায়ও নতুন দিগন্ত খুলে দেবে এই পদ্ধতি। আর এন এ আই-এর সাহায্যে শরীরের ভিতরে ক্যানসারের জন্য দায়ী আর এন এ-কে ধ্বংস করে দিতে পারলে ক্যানসার নিরাময় করা সম্ভব।



জয় সেনগুপ্ত

১৯৯১ থেকে গাড়ি নিয়ে ছোটার শুরু। ৩৭ বছরের মাইকেল শুমাখার এবার বিদায় নিলেন ফরমুলা ওয়ান কার রেসিং থেকে। লিখেছেন শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ট্র্যাক ছাড়লেন শুমাখার



ফরমুলা ওয়ান



পড়ার বইয়ের ফরমুলার মতো এ-ফরমুলা নীরস নয়! এখানে সাঁই-সাঁই করে ছুটে চলেছে একের পর এক গাড়ি, নীল গাড়ি টপকে গেল হলদেটা, সেটা আবার একটা বাঁক নিয়ে পিছনে ফেলে দিল সবুজ পক্ষীরাজকে! কিন্তু সামনের ওই লাল গাড়িটা সকলের আগে যে ছুটে চলেছে, তাকে ধরে সাধ্য কার! এমন জোরে চালাচ্ছেন লাল গাড়ির সওয়ারি, যেন পিছনে কেউ তাড়া করেছে! কিন্তু "ছুটলে গাড়ি থামায় কে, আজকে ঠেকায় আমায় কে?" গাইতে-গাইতে চালক ততক্ষণে ফেরারি নিয়ে ফেরার! হাজার-হাজার মানুষ হাততালি দিয়ে চলেছে। না, তিনি পালিয়ে যাননি কোথাও, ফিনিশিং লাইনে পৌঁছে অপেক্ষা করছেন! প্রথম পুরস্কার জিতে মুখে পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে জিরিয়ে নিচ্ছেন।

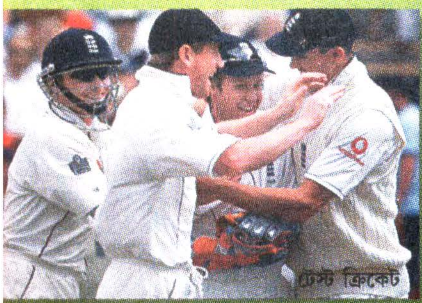
ফরমুলা ওয়ান কার রেসিংয়ে অন্যতম সেরা মাইকেল শুমাখারকে নিয়ে কোনও ছবি আঁকা হলে, খানিকটা এরকমই হবে হয়তো বর্ণনাটা। কিন্তু শিল্পী এবার হতাশ, আর যে এ-ধরনের ছবি আঁকার উপায় রইল না! কয়েক দিন আগেই অবসর নিলেন মাইকেল 'রেন কিং' শুমাখার (বৃষ্টিভেজা ট্র্যাকে নাকি তিনি অপ্রতিরোধ্য, তাই এই উপাধি)! সাও পাওলোয় অনুষ্ঠিত ব্রাজিলিয়ান গ্রাঁ প্রি-তে জীবনের শেষ ম্যাচটায় খেলতে নেমে অবশ্য একটু অসুবিধেয় পড়েছিলেন কার রেসিংয়ের এই জাদুকর! সহ-খেলোয়াড় নিকো রোজ়বার্গের গাড়ি উলটে যায় ট্র্যাকের মাঝখানে। সেই গাড়ির একটি ছোট টুকরো শুমাখারের গাড়ির টায়ারও ফুটো করে দেয়। তাই চতুর্থ স্থান নিয়েই খুশি থাকতে হল তাঁকে।

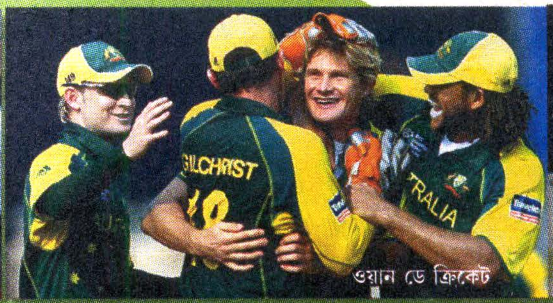


তবে খেলা শুরু হওয়ার আগে পেলের দেওয়া ট্রোফি, ফ্যানদের উন্মাদনা নিশ্চয়ই শুমাখারের কাছে সব সময় সুখস্মৃতি হয়েই থাকবে। আর ভবিষ্যতে হয়তো বা ফার্মিংয়ের কাজ করতে-করতে (খেলা ছাড়ার পর এমনই ইচ্ছে তাঁর) মনে পড়বে ৯১টি জয়ের কথা, সাত-সাতটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাবের কথা, জর্ডান, বেনেটন এবং ফেরারি টিমের কথা এবং সর্বোপরি ভক্তদের কথা। তাই রেসিং ট্র্যাক ছাড়ার আগে বক্তৃতা দেওয়ার সময় খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি। "শব্দ মনের ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই ভাষায় বোঝাতে পারছি না, মোটর স্পোর্টের এই জগৎটা আমার কাছে কতখানি প্রিয়। এখান থেকে যা পেয়েছি, তাতে আমি দারুণ খুশি।" অবশ্য এরকম আকাশ-ছোঁয়া জনপ্রিয়তায় কে না খুশি হবেন! বিবিসি-র প্রায় ১০,০০০ পাঠক নিয়ে একটি সমীক্ষায় শুমাখার 'শ্রেষ্ঠ গ্রাঁ প্রি ড্রাইভার'-এর তকমা পান।

সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল অটোমোবাইল ফেডারেশন-এর একটি সমীক্ষায় তিনিই সবচেয়ে জনপ্রিয় ফরমুলা ওয়ান খেলোয়াড়। ২০০২-এ পেয়েছেন 'লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টসম্যান অফ দ্য ইয়ার' পুরস্কার। শুমাখার সুনামিতে বিধ্বস্ত মানুষের পাশেও দাঁড়িয়েছিলেন। দিয়েছিলেন ১০ মিলিয়ন ডলার। টাকা তোলার জন্য খেলেছেন ফুটবলও। এরকম বর্ণময় মানুষটি পেশাদার খেলা থেকে বিদায় নিলেও, সাধারণ মানুষ কোনওদিনই তাঁকে ভুলবে না।

২০ ওভার করে ব্যাট এবং ২০ ওভার করে বল। অনেকে মনে করছেন একদিনের ক্রিকেটকে টেক্কা দেবে এই স্বল্প ওভারের ক্রিকেট। লিখেছেন চন্দন রুদ্র


টেস্ট ক্রিকেট


ওয়ান ডে ক্রিকেট


টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট

টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট

টেস্ট ক্রিকেটের জনপ্রিয়তায় ভাগ বসাতে এসে পড়েছিল একদিনের ক্রিকেট। এবার একদিনের ক্রিকেটের জনপ্রিয়তায় ভাগ বসাতে এসে পড়ল টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট। ২০ ওভার করে ব্যাট এবং ২০ ওভার করে বল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ২৪০ বলের লড়াইয়ে জয়-পরাজয় শেষ। সম্প্রতি কাউন্টি ক্রিকেটে নর্দাম্পটনশায়ারের হয়ে টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলে ফিরেছেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

কিন্তু টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট কি আদৌ ক্রিকেট? এই স্বল্প ওভারের ক্রিকেট দিয়ে কী একজন ক্রিকেটারের মান নির্ধারণ করা সম্ভব? এমন সব প্রশ্নই তুলেছেন ক্রিকেটবোদ্ধারা।

১১ জন ক্রিকেটার ২০ ওভার ব্যাট করবেন। অর্থাৎ ১২০টি বলের মোকাবিলা করতে নেমে প্রতিটি ব্যাটসম্যানেরই লক্ষ্য থাকবে দলের রান বাড়িয়ে নেওয়ার। সেখানে ক্রিকেটের ব্যাকরণ মেনে ব্যাট করার প্রবণতা লঙ্ঘিত হবে পদে-পদে। সারা মাঠ জুড়ে দেখা যাবে শুধু চার আর ছয়ের ছড়াছড়ি। কিছু দর্শক হয়তো উল্লসিত হবেন, কিন্তু আদপে ক্রিকেটের মান অনেকটাই নেমে যাবে।

এই নতুন ক্রিকেট নিয়ে ক্রিকেটারদের মধ্যেও ভাল-মন্দ দু'রকম কথা শোনা যাচ্ছে। ভারতীয় দলের স্পিনার হরভজন সিংহ বলেছেন, "ইংল্যান্ডে আমি টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে এসেছি। প্রচুর দর্শক দেখেছি মাঠে। দর্শক ও ব্যাটসম্যানদের কাছে খেলাটা দারুণ উত্তেজক। কিন্তু বোলারদের কাছে খেলাটা খুবই আতঙ্কের। বোলাররা সব সময়ই মানসিক চাপে থাকেন। প্রতি বলে রান তোলা যায়। তাই বোলারদের কাছে প্রতিটি বলই চ্যালেঞ্জ।"

টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট যতই আকর্ষক হোক, বোলারদের কাছে দুঃস্বপ্ন বলে মনে করছেন হরভজন।

এদিকে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড়ের পর উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান মহেন্দ্র সিংহ ধোনিও টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের পক্ষে সওয়াল করেছেন, "দেশের মাটিতে এই নতুন ধরনের ক্রিকেট বেশি করে খেলার জন্য মুখিয়ে আছি।" তিনি জানালেন, "খেলাটা কার্যত বাউন্ডারি এবং ওভার বাউন্ডারির। দর্শকরা দারুণ উপভোগ করবেন। প্রতিযোগিতা বাড়বে। আমাদের অনেক পরিকল্পনা করে খেলতে হবে।"

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও শুরুতে টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট চালুর পক্ষে ছিল না। ভারতীয় বোর্ডকর্তাদের এমনও বলতে শোনা গিয়েছে, "আমাদের দেশে ক্রিকেট যথেষ্ট জনপ্রিয় খেলা। টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট নিয়ে আমরা ভাবতে যাব কেন? ওসব ভাববে নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড। ওখানে মাঠে দর্শক হয় না।"



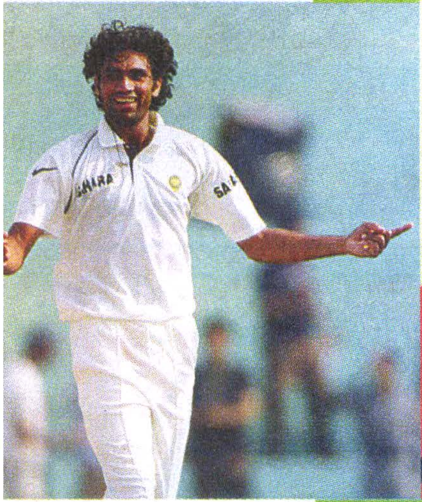
অন্য দিকে একদিনের ক্রিকেটের তুলনায় অল্প সময়ের খেলা হলে স্পনসরশিপ থেকে আয় কমে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকছে।

কিন্তু পালটা যুক্তি বলছে, ফুটবল, বক্সিং, অ্যাথলেটিক্স, অল্প সময়ের খেলা হলেও সেখানে স্পনসরশিপের কোনও অভাব নেই। আর যেসব দেশ 'সময়সাপেক্ষ খেলা' বলে এখনও ক্রিকেটকে গ্রহণ করেনি, তারাও অল্প সময়ের খেলা হলে খেলাটাকে আপন করে নেবে, আখেরে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বাড়বে। প্রথমে বিরোধীর ভূমিকা পালন করলেও শেষে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড দেশে টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট চালু করার এবং আগামী বছর বিশ্বকাপে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। ভারতীয় বোর্ডের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে আই সি সি।

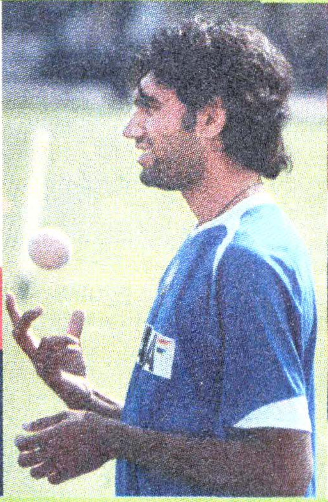
অস্ট্রেলিয়ার ধনকুবের কেরি প্যাকারকে 'একদিনের ক্রিকেটের জনক' বলা হয়। তাঁর হাত ধরেই সাবালক হয়েছিল ওয়ান-ডে ক্রিকেট। রাতের আলোয় সাদা বল, রঙিন পোশাকে একদিনের ক্রিকেটকে নতুন মোড়কে পরিবেশন করেছিলেন তিনি। সাতের দশকের মাঝামাঝি কেরি প্যাকারের ওই ক্রিকেটকে বিশুদ্ধবাদীরা 'সার্কাস' আখ্যা দিলেও, পরবর্তীকালে তাঁর সার্কাসই জনপ্রিয়তায় পাঁচদিনের সনাতনী ক্রিকেটকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। এখন টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ওয়ান-ডে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা কেড়ে নিতে পারে কি না সময়ই বলবে সে কথা।


গত বছর বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ

গুজরাতের এক ছোট্ট শহর ইখরের মুনাফ পটেল কি আগামী দিনে ভারতীয় ক্রিকেটের 'মহাতারকা' হয়ে উঠবেন? উত্তর খুঁজেছেন **অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়**









মুনাফ কি পারবেন 'মহাতারকা' হতে?

গু ড লে ং থ

বোলিংয়ের গড় ৮-২-১৮-৩! অনেকেই বলবেন যে, এমন কিছু আহামরি নয়! তবে মুনাফের এই বোলিং গড়ই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফিকে ঘিরে ফ্লিনটফদের সব স্বপ্ন চুরমার করে দিয়েছিল। এই জয়ে মুনাফ পটেলের ভূমিকা হেলাফেলার নয়।

"আমার মা চান, আমি যেন ২০০৭ বিশ্বকাপে খেলতে পারি।" বলেছেন মুনাফ পটেল। মুনাফের এই বক্তব্য বেশ কয়েক দিন আগের। কারণ, তখনও তিনি জানতেন না যে, ২০০৭ বিশ্বকাপে ভারতের অন্যতম ফেভারিট হিসেবে তাঁকেই ধরছেন অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ। মুনাফের জন্ম রক্ষণশীল পরিবারে। তাঁদের পরিবারে ক্রিকেট খেলার চল ছিলই না, বরং এই খেলা নিয়ে উৎসাহ দেখানোরও কোনও সুযোগ ছিল না মুনাফের। ঘটনাচক্রে একদিন ভারতীয় ক্রিকেট দলের নির্বাচক কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান কিরণ মোরের নজরে পড়ে যান মুনাফ। মুনাফকে চেন্নাইয়ের ক্যাম্পে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেন মোরেই। চেন্নাইয়ে মুনাফ পেয়ে যান টি এ শেখর এবং ডেনিস লিলিকে। প্রশিক্ষণ দেখতে আসা প্রাক্তন অস্ট্রেলিয় অধিনায়ক স্টিভ ওয়ারও পছন্দ হয়ে যায় এই শান্ত অথচ স্পষ্টবাদী ফাস্ট বোলারকে।



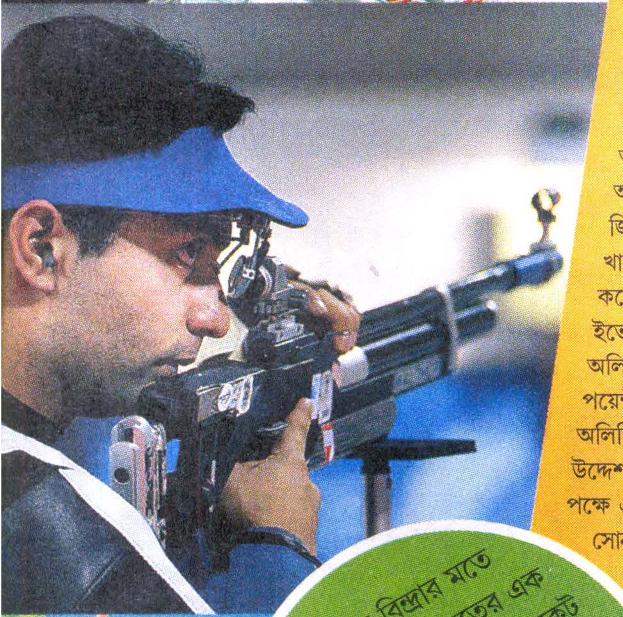
মুনাফ কোনও ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট খেলার আগেই এম আর এফ ক্যাম্পে সুযোগ পেয়েছিলেন। আবার গুজরাতে জন্মালেও মুনাফ শুধুমাত্র সেখানেই খেলেননি, তিনি পশ্চিমাঞ্চলের হয়ে দলীপ ট্রোফিও খেলেছেন, আবার মহারাষ্ট্রের হয়েও খেলেছেন। এমনকী মুম্বইয়ের হয়েও রঞ্জি ট্রোফি খেলেছেন। যদিও মুম্বইয়ের হয়ে খেলার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন সচিন তেন্ডুলকর।

২০০৪ সালে চোট-আঘাতের সমস্যায় ভুগতে থাকেন মুনাফ। তাঁকে চিকিৎসার জন্য 'অস্ট্রেলিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টস'-এ পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর বোলিং অ্যাকশন পরীক্ষার জন্য বায়োমেকানিক্যাল অ্যানালিসিস পর্যন্তও করা হয়। ফলে অনিশ্চিত হয়ে ওঠে তাঁর ক্রিকেটজীবন। এত ঘটনায় অবশ্য দমে যাননি মুনাফ। ফিরে এসেই বোর্ড প্রেসিডেন্ট ইলেভেনের বিরুদ্ধে ১০ উইকেট নেন। তারপর? তারপর আর কিছুই না, পুরস্কার হিসেবে পেয়ে যান ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় জাতীয় দলে থাকার সুযোগ এবং প্রথম সুযোগেই তিনি চমক দেখিয়ে দেন। অভিষেক টেস্ট ম্যাচেই ৯৭ রানে ৭ উইকেট!

তিনিই এখন ভারতের একমাত্র পেস বোলার, যিনি উইকেটের দু' দিকেই সুইং করাতে পারেন এবং নিয়মিতভাবে ঘণ্টায় ৮৭ মাইল বেগে বল করেন। এখনও পর্যন্ত তিনি টেস্টে ৬ ম্যাচে ২৪টি উইকেট নিয়েছেন এবং একদিনের ক্রিকেটে ১১টি ম্যাচে ১২টি উইকেট নিয়েছেন।

বিশ্বকাপের এখনও বেশ কয়েক মাস বাকি, কিন্তু এর মধ্যেই বেশ কয়েকটি ম্যাচের ফলাফলই আমাদের জানিয়ে দেবে বিশ্বকাপে ভারত কেমন জায়গায় থাকবে। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড বা পাকিস্তানের দুর্দান্ত ফাস্ট বোলিংয়ের যোগ্য জবাব আজ টিম ইন্ডিয়ায় আছে, এ কথা বেশ জোর গলায় বলার সময় বোধ হয় এসে গিয়েছে!





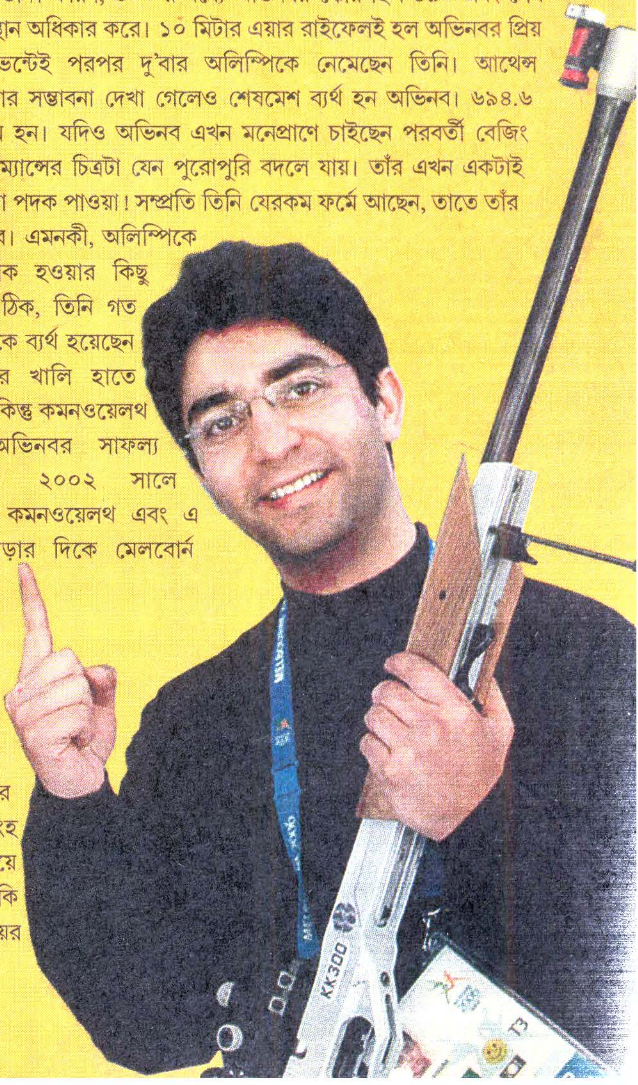


বিন্দ্রার অভিনবত্ব

অভিনব বিন্দ্রার মতে শুটিং হল এখন ভারতের এক নম্বর খেলা। তা হলে কি ক্রিকেট বিশ্বকাপের চেয়ে পরবর্তী বেজিং অলিম্পিকের উপর আমাদের বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত? আলোচনা করেছেন সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়

যদিও ক্রিকেটারদের মতো তিনি ততটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেননি, তবুও তিনি রাতারাতিই শুটিংয়ের 'ব্লু-আইড বয়' থেকে দেশের অন্যতম সেরা স্পোর্টস আইকনে পরিণত হয়েছেন। হ্যাঁ, তিনি হলেন অভিনব বিন্দ্রা। ক্রিকেটারদের সঙ্গে তুলনা করার কারণ, বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েও পরিমার্জন নেগি বা গল্‌ফে আলোড়ন তোলা শিব কপূররা কলকে পান না আমাদের দেশে। জাগ্রেব থেকে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের সোনা নিয়ে আসার পর বীরেন্দ্র সহবাগের শহরে বসে তিনি স্পষ্টভাবে বললেন, "ক্রিকেট বা অন্য কিছু নয়, শুটিংই এখন দেশের এক নম্বর খেলা। আর কোন খেলায় ভারতে অলিম্পিক পদক এসেছে? একাধিক বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সোনা, নতুন-নতুন বিশ্বরেকর্ড, সাফল্যের বিচারে কোনও দিক থেকেই শুটারদের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবেন না অন্য খেলার তারকারা।"

তাঁর এই ক্ষোভ খুব স্বাভাবিক। কারণ, জাগ্রেবে আই এস এস এফ বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে শুটারদের পারফরম্যান্স ভারতের অন্য যে-কোনও খেলার তুলনায় অনেক-অনেক ভাল। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই ইউরোপিয়ান সার্কিটে ঝড় তোলেন অভিনব। জেদ, আত্মবিশ্বাস, 'কিলার ইনস্টিংক্ট' অভিনবর সাফল্যের চাবিকাঠি এই তিনটি জিনিস। অল্প বয়সেই অলিম্পিকের মতো বড় আসরে অংশগ্রহণ করলেও, মোটেও খারাপ ফল করেননি তিনি। কারণ, ৬০০-র মধ্যে অভিনবর স্কোর ছিল ৪৯০ এবং শেষ করেছিলেন ১১ নম্বর স্থান অধিকার করে। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলই হল অভিনবর প্রিয় ইভেন্ট এবং এই ইভেন্টেই পরপর দু'বার অলিম্পিকে নেমেছেন তিনি। আথেন্স অলিম্পিকে পদক জেতার সম্ভাবনা দেখা গেলেও শেষমেশ ব্যর্থ হন অভিনব। ৬৯৪.৬ পয়েন্ট তুলে তিনি সপ্তম হন। যদিও অভিনব এখন মনেপ্রাণে চাইছেন পরবর্তী বেজিং অলিম্পিকে তাঁর পারফরম্যান্সের চিত্রটা যেন পুরোপুরি বদলে যায়। তাঁর এখন একটাই উদ্দেশ্য, অলিম্পিকে একটা পদক পাওয়া! সম্প্রতি তিনি যেরকম ফর্মে আছেন, তাতে তাঁর পক্ষে এখন সবকিছুই সম্ভব। এমনকী, অলিম্পিকে সোনা জিতলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এটা ঠিক, তিনি গত দু'টো অলিম্পিকে ব্যর্থ হয়েছেন অর্থাৎ দু'বার খালি হাতে ফিরেছেন। কিন্তু কমনওয়েলথ গেম্‌সে অভিনবর সাফল্য নজরকাড়া। ২০০২ সালে ম্যাঞ্চেস্টার কমনওয়েলথ এবং এ বছরের গোড়ার দিকে মেলবোর্ন কমনওয়েলথ, দু'টো গেম্‌স মিলিয়ে ওঁর ঝুলিতে আছে তিনটি সোনা, দু'টি রুপো এবং একটি ব্রোঞ্জ। তা ছাড়া অভিনবই হলেন প্রথম ভারতীয়, যিনি জাগ্রেবের মতো বিশ্ব আসরে সোনা জিতেছেন। রাজ্যবর্ধন সিংহ রাঠোরের সাফল্যই অভিনবর সবচেয়ে বড় 'মোটিভেশন'। তা হলে আমরা কি এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বদলে বেজিংয়ের দিকেই তাকিয়ে থাকব?



বই লিখেছেন মাতোরাজ্জি



বার্লিনে বিশ্বকাপ ফাইনালে মার্কো মাতোরাজ্জির মন্তব্যে চটে গিয়ে মাথা দিয়ে তাঁর পেটে ঢুঁসো মেরে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন ফ্রান্স অধিনায়ক জিনেদিন জিদান। পরে জিদান বলেছিলেন, মাতোরাজ্জি কটু কথা বলেছেন। যদিও ইতালীয় ডিফেন্ডার সেই অভিযোগ সরাসরি খণ্ডন করে দেন। তবে ঠিক কী বলেছিলেন মাতোরাজ্জি? সেই ঘটনা নিয়ে এবার নিজেই একটা বই লিখে ফেলেছেন তিনি। বইটির নাম 'হোয়াট আই রিয়েলি সেড টু জিদান'। সদ্য সমাপ্ত ফ্রাঙ্কফুর্ট বই মেলায় বইটি প্রদর্শিত হয়েছে। ১০ ইউরো খরচ করলেই ১০০ পাতার বইটি পাওয়া যাবে। বেশ কয়েকটি ভাষায় বইটি অনুবাদের কথাও ভাবছেন মাতোরাজ্জি। তবে বই বিক্রির পুরো টাকাটাই যাবে ইউনিসেফের দফতরে।

মেজাজি মুডে ম্যাকেনরো

জন ম্যাকেনরো টেনিসের এক বর্ণময় চরিত্র। আমেরিকার এই প্রাক্তন টেনিস তারকাকে আবার র‍্যাকেট হাতে মেজাজি মুডে দেখা গেল। সুইডেনের রাজধানী শহর স্টকহোমের এক প্রতিযোগিতায় জোনাস বর্কম্যানকে সঙ্গী করে ডাবল্‌সে অংশ নিলেন তিনি। ১৯৯২ সালে এ টি পি টুর থেকে অবসর নেওয়ার আগে ১৯৮৫ সালে এই কোর্টেই ম্যাকেনরো তাঁর টেনিস জীবনের শেষ সিঙ্গল্‌স খেতাবটি জিতেছিলেন। ২১ বছর পর সেই কোর্টে ফিরে দর্শকদের বিপুল অভিনন্দন কুড়োলেন তিনি। ম্যাকেনরো জানিয়েছেন, "এই কোর্টেই আমি প্রথমবার বিয়ন বর্গের মুখোমুখি হয়েছিলাম। বর্গই আমার টেনিস জীবনের সেরা প্রতিদ্বন্দ্বী।" প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে গেলেও তাঁর খেলা দেখতে দর্শকাসনে উপস্থিত ছিলেন বিয়ন বর্গ, স্তেফান এডবার্গের মতো প্রাক্তন টেনিস নক্ষত্ররা।

বড় জয়ের লড়াইয়ে নামছেন লায়লা

মহম্মদ আলির যোগ্য উত্তরসূরি তাঁর মেয়ে লায়লা। গত বছর খেতাব জয়ের পর কিছুদিন স্পটলাইটের বাইরেই ছিলেন তিনি। তবে তাঁকে ঘিরে লাফালাফি এতটুকু কমেনি বা তাঁর জনপ্রিয়তায় এতটুকু টান পড়েনি। আবার লড়াইয়ে নামছেন লায়লা আলি। গত বছর প্রথম মহিলা বক্সার হিসেবে ওয়ার্ল্ড বক্সিং কাউন্সিল খেতাব জিতে ইতিহাস গড়েছিলেন তিনি। তিন রাউন্ডেই প্রতিপক্ষ বক্সার এরিন টাফাইলকে ধরাশায়ী করে বিশ্ব খেতাব জিতে নিয়েছিলেন। লায়লা এবার আবার বড় লড়াইয়ের জন্য রিংয়ে নামছেন। ১১ নভেম্বর বিখ্যাত ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে লড়বেন তিনি। ইতিমধ্যে চুক্তিতে সই হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ৩৫ বছর আগে এই বক্সিং রিংয়েই বিশ্ব হেভিওয়েট খেতাবি লড়াইয়ে নেমে জো ফ্রেজিয়ারের কাছে হেরে গিয়েছিলেন তাঁর বাবা মহম্মদ আলি। তবে লায়লা চাইছেন বড় জয়।



হাইজাম্পে পুরনো রেকর্ড ভাঙলেন হরিশঙ্কর



চোট সারিয়ে আবার ফর্মে ফিরেছেন জলপাইগুড়ি জেলার একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলে হরিশঙ্কর রায়। ২০০৪ সালে সিঙ্গাপুরের এশিয়ান অলস্টার মিটে ২.২৫ মিটার লাফিয়ে হাইজাম্পে দেশের হয়ে সেরা সাফল্য তুলে এনেছিলেন তিনি। দিল্লিতে এবারের জাতীয় ওপেন অ্যাথলেটিক্সে ২.১৮ মিটার লাফিয়ে ১৩ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিলেন হরিশঙ্কর। কোচ সুভাষ সরকার মনে করেন, তাঁর ছাত্রটি আসন্ন দোহা এশিয়াডে দেশকে পদক এনে দিতে পারেন।

ডোপিং জালে শোয়েব-আসিফ



ফুটবলে মারাদোনার মতোই বর্ণময় চরিত্র পাকিস্তানি ফাস্টবোলার শোয়েব আখতার। কিছুদিন আগে তাঁরা আবার একই ফ্রেমে চলে এলেন। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড আয়োজিত ডোপ পরীক্ষায় ধরা পড়লেন শোয়েব, সঙ্গে আসিফও একই অভিযোগে ধরা পড়লেন। অপরাধ? ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় দু'জনের মূত্রের নমুনাতেই নাকি নিষিদ্ধ পদার্থ ন্যানড্রোলন পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তাতে 'রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস'-এর ব্যবহারে কোনও পরিবর্তন আসেনি। তিনি সগর্বে ঘোষণা করেছেন, "উইকেট নেওয়ার জন্য আমার ডোপিং করার দরকার পড়ে না।"

চন্দন রুদ্র

ANANDAMELA NOVEMBER 2006 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/2004-06 & SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/FGN-20/2004-06 RNI NO.27057/75 LPWP NOS. SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/LPWP-19/2004-06 & SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/FGN-06/LPWP-FGN-02/2004-06 INR 10.00

